প্রকাশনার ৩৬ বছর

অগ্রপথিক

নভেম্বর ২০২১

জেল হত্যা দিবস সংখ্যা

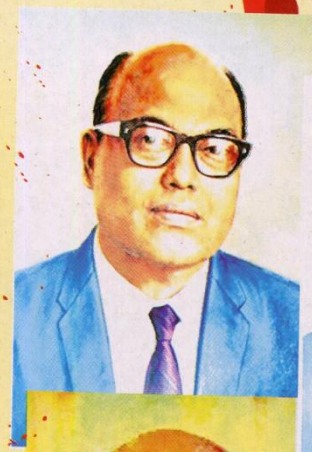

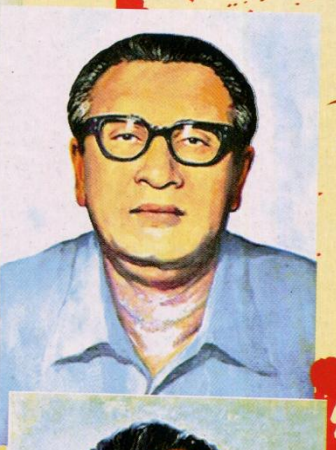

প্রকাশনার ৩৬ বছর

অগ্রপথিক

সৃ জ ন শী ল মা সি ক

ছত্রিশ বর্ষ ❑ সংখ্যা ১১

নভেম্বর ২০২১ ॥ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৮ ॥ রবি. আউ.-রবি. সানি- ১৪৪৩

প্রধান সম্পাদক

ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান

সম্পাদক

মোহাম্মদ আনোয়ার কবির

প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

নিয়মাবলী

- অগ্রপথিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সৃজনশীল মাসিক মুখপত্র।
- ইসলামের সুমহান জীবনাদর্শ প্রচার ও প্রসারে বিতর্কের উর্ধ্বে থেকে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, জীবনী, তথ্যমূলক ফিচারসহ সৃজনশীল লেখকদের গল্প, কবিতা, নাটক, স্মৃতিকথা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি,শিল্পকলা, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক লেখা প্রকাশ এবং মননশীল পাঠক তৈরি করা অগ্রপথিকের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি বিশ্ব মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।
- উদ্দেশ্যের অনুকূলে যে কেউ তাঁর নির্বাচিত মূল্যবান লেখাটি অগ্রপথিক-এ প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে অবশ্যই স্পষ্ট ও নির্ভুল হতে হবে। কাগজের দুই পৃষ্ঠায় গ্রহণযোগ্য নয়। অগ্রপথিক-এর ই- মেইল ঠিকানায়ও লেখা পাঠাতে পারেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না। প্রকাশিত লেখার সম্মানী দেয়া হয়। লেখা সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বিক্রয় শাখা (বায়তুল মুকাররম, ঢাকা) সহ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে অগ্রপথিকসহ অন্যান্য প্রকাশনা কিনতে পাওয়া যায়।

প্রচ্ছদ
ফারজীমা মিজান শরমীন

মূল্য : ২০ টাকা

যোগাযোগ
সম্পাদক
অগ্রপথিক
প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫১৯
E-mail : ifa.agropothik@gmail.com

সম্পাদকীয়

জেলহত্যা দিবস

বাঙালি জাতির ইতিহাসে অন্যতম শোকের দিন ৩ নভেম্বর। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পরে ৩ নভেম্বর জেলখানায় জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ড সবচেয়ে ঘৃণিত কাপুরুষোচিত এবং কলঙ্কজনক ঘটনা। মুষ্টিমেয় ঘাতকদের এই হত্যাকাণ্ড পুরো জাতিকে লজ্জিত ও স্তম্ভিত করে দেয়। ১৯৭১ সালে জাতির চরম দুর্দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার পরে তাঁর সুযোগ্য সহযোদ্ধা এই জাতীয় চার নেতা যেভাবে হাল ধরে সশস্ত্র স্বাধীনতা অর্জনে জাতিকে নেতৃত্ব দান করেছিলেন তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। পৃথিবীর বুকে যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ এই চারনেতার নামও অমলিন থাকবে। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, মনসুর আলী, এএইচএম কামরুজ্জামান– এই জাতীয় চার নেতা ঘাতকদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে লড়াইয়ের জন্য জেলখানাকেই বেছে নিয়েছিলেন। ঘাতকচক্র নিশ্চিত ছিলো এরা জীবিত থাকলে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে বেশি দিন প্রয়োজন হবে না। মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা– জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশ পরিচালনা, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল বাংলাদেশ থেকে কোনদিনও এই ভূখণ্ডকে পেছনে টেনে নেওয়া সম্ভব হবে না। আর তাই বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে মাত্র আড়াই মাসের মাথায় জেলখানায় শাহাদাৎবরণ করতে হলো এই চার নেতাকে। জেলখানায় চারনেতার হত্যাকাণ্ড জাতি হিসেবে আমাদেরকে বিশ্ব দরবারে কলংকের চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। জাতীয় চার নেতার আত্মোৎসর্গ আমাদের জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে শিক্ষণীয় ঘটনার অন্যতম। কীভাবে নিজের জীবন দিয়ে আদর্শকে সমুন্নত রাখতে হয়, কীভাবে নেতা, দেশ ও জাতিকে ভালোবসতে হয়– সে শিক্ষা রয়েছে ৩ নভেম্বরের ঘটনার মধ্যে। আপোষকামিতা,

সুবিধাবাদিতার বিপরীতে রাজনীতির মহান ত্যাগ তিতিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ৩ নভেম্বর। আমরা মহান রাব্বুল আলামিন-এর কাছে মুনাজাত জানাই বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারবর্গ, জাতীয় চার নেতাসহ এই দেশের সকল শহীদকে জান্নাত দান করুন।

সংবিধান দিবস

প্রতিটি জাতির সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল প্রতীকের অন্যতম সংবিধান। ৩০ লক্ষ শহীদ, ৪ লক্ষাধিক মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পর পরই ১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের জন্মের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আদর্শকে ধারণ করে তৈরি হয় আমাদের সংবিধান। ৪ নভেম্বর জাতীয় সংসদে পাশ হয় এই সংবিধান। সংবিধানের কারণে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ৪ নভেম্বর এক ঐতিহাসিক দিন। পৃথিবীর সকল দেশে সংবিধান দিবস গুরুত্ব সহকারে পালিত হয়। সংবিধান একটি জাতির পবিত্র আমানত। সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয় একটি দেশ। সংবিধানের মধ্য দিয়ে একটি জাতি রাষ্ট্রের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটে। সংবিধানের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বিশ্ব দরবারে রাষ্ট্র জাতির অবস্থান সমুন্নত হয়। আর তাই আধুনিক বিশ্বে সংবিধান বিহীন কোন রাষ্ট্র চিন্তাও করা যায় না, সংবিধান বিহীন কোন রাষ্ট্র তৈরি হয় না। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ এর সাবেক চেয়ারম্যান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম-এর সংবিধান দিবস নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা আমরা এই সংখ্যায় প্রকাশ করলাম।

ভারতবর্ষের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ মুসলিম মনীষী মাওলানা আবুল কালাম আযাদের জন্মদিন ১১ নভেম্বর। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট, ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে তিনি অসাধারণ দায়িত্ব পালন করেন। একজন মুসিলিম হিসেবে ইসলামি বিষয়সমূহেও তিনি ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত। তাঁর পবিত্র কুরআনের তাফসীরসহ ধর্মীয় বিষয়েও অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে। অপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী আবুল কালাম আযাদ পবিত্র ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এই মহান মনীষীর জীবনীর উপর বর্তমান সংখ্যায় আমরা দু'টি বিশেষ লেখা প্রকাশ করছি।

প্রখ্যাত মুসলিম মনীষী সুফি লেখক ইদ্রিস শাহ'র মৃত্যুদিন ২৩ নভেম্বর। প্রাশ্চাত্যে ইদ্রিস শাহ'কে নিয়ে অসংখ্য লেখালেখি ও আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। এই মহান সুফি লেখকের উপরও আমরা একটি বিশেষ লেখা প্রকাশ করছি। আশা রাখি অন্যান্য সংখ্যার মতো বর্তমান সংখ্যাটিও পাঠকদের প্রত্যাশা পূরণ করবে।♦

সূচি

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম
গাজী মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম জাবির
গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র)♦০৯
মুফতী মো. আবদুল্লাহ
হিজড়া জনগোষ্ঠী ও ইসলামী শরীয়তের নির্দেশনা♦১৪

কলঙ্কময় জেলহত্যা
শামস সাঈদ
জেলহত্যা : ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়♦২৩

সংবিধান দিবস
বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম
বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় সংবিধান ও আগামী প্রজন্মের কাছে প্রত্যাশা♦৩৪

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ড. মাহফুজ পারভেজ
মাওলানা আযাদ : রাজনীতিতে ধর্মীয় সম্প্রীতির অগ্রদূত♦৩৯
ড. এ সালাম
শিক্ষিত জাতি গঠনে মাওলানা আযাদের অবদান♦৪৩

মুজিববর্ষ

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
বঙ্গবন্ধুর আমার দেখা নয়াচীনে ধর্মীয় চিন্তাধারা♦৫৩

মুসলিম মনীষী

কাজী আখতারউদ্দিন
সুফি লেখক ইদ্রিস শাহ
(১৬ জুন ১৯২৪-২৩ নভেম্বর ১৯৯৬)♦৮২

ইতিহাস ও ঐতিহ্য

মঈনুল হক চৌধুরী
বায়তুল হিকমা : ইতিহাসের বিখ্যাত গ্রন্থাগার♦৯৮

কবিতা

শামসুল ফয়েজ
স্বদেশীবাজারে গলাগলি করে
বাস করে তুলসি ও মুনসি♦১০৫
সেলিম মাহমুদ
অশ্রান্ত আকাশ♦১০৬
মুস্তফা হাবীব
একটি গোলাপের জন্য♦১০৭
আসাদুল্লাহ্
করতলে জ্বলন্ত অঙ্গার♦১০৮
চন্দনকৃষ্ণ পাল
রঙ দিয়ে রঙ মুছে ফেলি♦১০৯
মাহফুজ রিপন
বায়ুতরঙ্গের বাহাস♦১১০
পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী
প্রিয় নবী♦১১১
নীহার মোশারফ
প্রচণ্ড শীতে♦১১২

গল্প

তাহমিনা কোরাইশী
এ মাটি আমার♦১১৩

সাহিত্য

গাজী সাইফুল ইসলাম
২০২১ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী
আব্দুর রাজ্জাক গুরনাহ : নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর♦১২০

স্মরণ

ইমাম মেহেদী
মন ও মননের কবি স্থপতি রবিউল হুসাইন♦১২৫

পরশমণি

আল-কুরআন

১। অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়ে যাও ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। *(সূরা জুমু'আ: ১০)*

২। কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। *(সূরা হা-মী-ম-আস্-সাজ্দাহ: ৩৩)*

৩। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দাখিল করবেন স্বীয় রহমতে। ইহাই মহাসাফল্য। পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় নাই? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।' *(সূরা জাসিয়া: ৩০-৩১)*

৪। আল্লাহ কারো উপর এমন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত। সে ভাল যা উপার্জন করে তার প্রতিফলন তারই। 'হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।'

আল-হাদীস

১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন: 'হযরত দাউদ (আ) বর্ম তৈরি করতেন, হযরত আদম (আ) কৃষি কাজ করতেন, হযরত নূহ (আ) কাঠ মিস্ত্রির কাজ করতেন, হযরত ইদ্রিস (আ) সেলাই কাজ করতেন এবং হযরত মূসা (আ) বকরী চরাতেন।' *(মুসতাদরাকে হাকীম)*

২। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন: 'নিজের হাতের কাজ ও শ্রম দ্বারা উপার্জিত খাদ্য খাওয়া অপেক্ষা উত্তম খাদ্য কেউ খেতে পারে না। হযরত দাউদ (আ) নিজের হাতের শ্রমের উপার্জিত খাবার খেতেন।' *(বুখারী শরীফ)*

৩। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন: 'শ্রমিকের কাজ বা কাজের মেয়াদ শেষ হলেই তার মজুরী পুরোপুরি দিতে হবে। *(মুসনাদে আহমদ)*

৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন: 'যে ব্যক্তি কোন রুজী রোজগারের জন্য শ্রমের পরিবর্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উত্থিত হবে যে, তার চেহারায় এক টুকরো গোশতও থাকবে না। *(বুখারী শরীফ)*

৫। মহানবী (সা) বলেছেন: 'কিয়ামতের দিন আমি তিনজন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হবো। তন্মধ্যে একজন হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করে তার কাজ আদায় করে বটে, কিন্তু তার মজুরি পরিশোধ করে না । *(বুখারী শরীফ)*

ফাতেহায়ে ইয়াজদহম

গাউসুল আজম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র)

গাজী মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম জাবির

১ রমযান ৪৭১ হিজরিতে ইরাকের অন্তর্গত জিলান জেলার কাসপিয়ান সমুদ্র উপকূলের নাইদ নামক স্থানে বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত আবু ছালেহ মুছা জঙ্গি (র) ও মাতার নাম সৈয়দা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (র)।

বড়পীর হিসেবে তিনি সবার কাছে পরিচিত

গাউসুল আজম হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (র)-কে একদা এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, ফকির সম্পর্কে। জবাবে তিনি বলেন, ফকির শব্দের 'ফে' হরফ বলে যে, তুমি মহান আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নিজেকে ফানা করে দাও এবং আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় সৃষ্ট বিষয়বস্তু হতে হৃদয়কে মুক্ত করে ফেল। 'ক্বাফ' হরফ বলে যে, তোমার কলবকে আল্লাহ প্রেমের শক্তি দ্বারা মজবুত কর এবং তার সন্তুষ্টিতেই সদাসর্বদা নিয়োজিত থাক। 'ইয়া' বলে যে, প্রত্যাশা আল্লাহরই নিকট

কর। তাঁরই অবলম্বন এবং লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা প্রভৃতি হীন প্রবৃত্তি হতে নিজেকে মুক্ত করে আল্লাহর দিকে রুজু কর।

গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (র) হলেন– ইসলাম ধর্মের অন্যতম প্রধান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। তিনি ইসলামের অন্যতম প্রচারক হিসেবে সুবিদিত। এ কারণে তাঁকে 'গাউসুল আযম' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তাকে 'বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র)' নামেও অভিহিত করা হয়।

আধ্যাত্মিকতায় উচ্চমার্গের জন্য বড়পীর, ইরাকের অন্তর্গত 'জিলান' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করায় জিলানী, সম্মানিত হিসেবে আবু মোহাম্মদ মুহিউদ্দীন প্রভৃতি উপাধি বা নামেও তাকে সম্বোধন করা হয়। আবদুল কাদের জিলানী (র) হিজরি ৪৭১ সনের রমযান মাসের ১ তারিখে ইরাকের জিলান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবু ছালেহ মুছা জঙ্গি এবং মাতার নাম সৈয়দা উম্মুল খায়ের ফাতেমা। তাঁর মাতা ছিলেন হাসান ইবনে আলীর বংশধর সৈয়দ আবদুল্লাহ সাওমেয়ির কন্যা। কথিত আছে যে, ভূমিষ্ঠ হয়েই রোযা রাখেন গাউছুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (র)।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় জিলানবাসীর কেউ রমযানের চাঁদ দেখতে পায়নি। সবাই রোযা রাখা না রাখার বিষয় নিয়ে সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেলেন। এমতাবস্থায় রাতের শেষাংশে সুবহে সাদেকের আগে অর্থাৎ ১ রমযান পৃথিবীতে আসেন হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র)। শিশু আবদুল কাদের জিলানী (র) জন্মের পর সুবেহ সাদেকের আগ পর্যন্ত দুধ ও মধু পান করেন। কিন্তু সুবহে সাদেকের পর তাকে আর কিছু খাওয়ানো যায়নি। এ আশ্চর্যজনক খবর ছড়িয়ে পড়ে সব জায়গায়। সবাই বুঝতে পারে মাহে রমযান শুরু হয়েছে।

অনেকেই বলে থাকেন নবীজিকে স্বপ্নে দেখেছিলেন গাউছুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (র)। ৫২১ হিজরির ১৬ শাওয়াল রোজ মঙ্গলবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নযোগে গাউছুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (র)-কে বলেন, হে আবদুল কাদের! তুমি মানুষকে কেন আল্লাহর পথে আহ্বান করছ না। মানুষকে কেন বঞ্চিত করছ। আবদুল কাদের (র) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আলী (রা)-এর আওলাদ।

সে সময় ইরাক শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব উন্নত ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পড়াশোনা ও ব্যবসার জন্য মানুষ বাগদাদ আসতেন। পড়াশোনার উদ্দেশ্যে হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) ব্যবসায়িক কাফেলার সঙ্গে বাগদাদ যাওয়ার পথে ডাকাতের কবলে পড়েন। তার মা সব সময় সত্য কথা বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাই তিনি ডাকাত দলের কাছে নিজের কাছে গচ্ছিত স্বর্ণ মুদ্রার কথা বলেন। ডাকাত সরদার আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন,

হে বালক! তুমি তো মিথ্যা কথা বলে আমার কাছ থেকে স্বর্ণ মুদ্রা লুকাতে পারতে। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) বলেন, মিথ্যা কথা বলতে আমার মা নিষেধ করেছেন। এ কথা শুনে ডাকাত সরদার বলেন, মায়ের আদেশ বালক তুমি এভাবে পালন কর। নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর আদেশ আরও যত্নের সঙ্গে পালন কর। আর আমি ও অন্য ডাকাতরা তো আল্লাহর আদেশই পালন করি না। মায়ের কথা তো অনেক দূরের কথা। এই বলে ডাকাত সরদার আফসোস করতে থাকেন ও বলেন, হে বালক! তুমি সাধারণ কোনো মানুষ নও। তুমি আমাকে কালেমা পড়াও। ডাকাত সরদারের সঙ্গে আরও ৬০ জন অশ্বারোহী ডাকাত ছিলেন। সবাই একসঙ্গে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান।

গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (র) একাধারে ৪০ বছর পর্যন্ত এশার নামাযের অজু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন। তিনি প্রতি রাতের একটা সময় জিকির ও মোরাকাবা করে কাটাতেন। যৌবনের অধিকাংশ সময় রোযা রেখে কাটিয়েছেন। যখন নফল নামায আদায় করতেন সূরা ফাতেহার পর সূরা আর রহমান, সূরা মুজ্জাম্মিল কিংবা সূরা ইখলাস পড়তেন। তন্দ্রার ভাব এলে কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও প্রসারে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন, মানুষের অন্তরে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা তৈরি করেছিলেন।

সঠিক পথে চলার জন্য মানুষকে বিভিন্ন আমল বাতলিয়ে দিতেন। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) যখন দুনিয়ার জীবন ত্যাগ করে পরপারে যান তখন হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর ভক্ত-অনুসারীরা তাঁর আমল ও চরিত্রকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে কাদেরীয়া তরিকা প্রবর্তন করেন।

ছোট থেকেই তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী

সত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (র) শিশুকাল থেকেই ছিলেন আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী। জিলান নগরীর একটি মক্তবে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভর্তি হন। একেবারে প্রাথমিক স্তরে পড়া অবস্থায়ই আলিফ-লাম-মীম হতে আরম্ভ করে আল-কুরআনের পনেরো পারার শেষ পর্যন্ত মুখস্থ পড়েছিলেন। তাঁর এই প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে ওস্তাদজি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কীভাবে কার কাছ থেকে এত সুন্দরভাবে কুরআন পড়া শিখেছ এবং কীভাবে ১৫ পারা কুরআন শরিফ মুখস্থ করলে? এ কথার জবাবে গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (র) বলেছিলেন, আমি প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াত করে থাকি, গর্ভাবস্থায় মায়ের পেটের মধ্যে থেকে আমি মায়ের তেলাওয়াত শুনে শুনে

আমারও মুখস্থ হয়ে গেছে। অর্থাৎ তিনি ১৫ পারা হাফেজ হয়েই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হন।

পযভাব শয়তানকে বোকা বানিয়েছিলেন

গাউছুল আযম বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (র) শয়তানকে বোকা বানিয়েছিলেন! কথিত আছে যে, একবার এক মরুপ্রান্তে তিনি ভ্রমণ করছিলেন। ইবাদত-বন্দেগি ও ধ্যান-সাধনার বিশেষ অবস্থায় ছিলেন তখন অদৃশ্য কোনো স্থান থেকে আওয়াজ আসে, 'হে আবদুল কাদের আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। সাধনার মাধ্যমে তুমি আজ এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছ যে, আমি আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছি। অতএব, এখন থেকে শরিয়তের কোনো বিধান তোমার ওপর বাধ্যতামূলক নেই। তুমি ইবাদত কর বা না কর, এতে কিছু আসে যায় না। যে কোনো ধরনের কাজে তুমি এখন থেকে স্বাধীন।' এ ধরনরে কথা শুনে হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) খুব দৃঢ়তার সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। অদৃশ্য আওয়াজটি বন্ধ হয়ে যায়। তিনি বলতে থাকেন, 'হে অভিশপ্ত শয়তান, তোর কুমন্ত্রণা থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোর এ প্রস্তাব শুনেই আমি বুঝতে পেরেছি যে, এ তোর ভয়াবহ কৌশল। আমাকে পথচ্যুত করার এক মারাত্মক কূটচাল। কেননা, সাধনার কোনো পর্যায়েই ইবাদত-বন্দেগির দায়িত্ব কারও ওপর থেকে তুলে নেওয়া হয় না। শরিয়ত অমান্য করার নির্দেশ আল্লাহ কখনো কোনো ব্যক্তিকে দেন না। তোর আওয়াজ শোনা মাত্রই আমি বুঝতে পেরেছি যে, এমন বাণী আল্লাহর পক্ষ থেকে আসতে পারে না। এ নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল।' এ কথা শুনে শয়তান বলল, 'এ ধরনের কথা বলে এর আগে আমি এই প্রান্তরের অন্তত ২৭ জন সাধকের সর্বনাশ করেছি। কিন্তু আজ আপনি নিজ প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও উচ্চ পর্যায়ের সাধনা বলেই রক্ষা পেয়ে গেলেন, হে যুগশ্রেষ্ঠ ওলি।' তখন তিনি বললেন, আল্লাহর খাস রহমত ছাড়া ধূর্ত প্রতারক শয়তান থেকে বেঁচে থাকার কোনো শক্তি ও ক্ষমতা আমার নেই।

গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর কিছু বাণী

★একদল অজ্ঞ, মূর্খ এবং ভণ্ডপীর, ভণ্ড দরবেশ বলে বেড়ায় যে, ইলমে শরিয়ত এবং ইলমে তরিকত দুটি সম্পর্ণ ভিন্ন জিনিস। এর একটির সঙ্গে অন্যটির কোনো সম্পর্ক নেই। এমন কি এরা মনে করে পরস্পরের সম্পর্কের কোনো প্রয়োজনও নেই। তারা শরিয়তের প্রয়োজনীয়তার ওপর তেমন গুরুত্ব দেয় না। শরিয়তকে তারা সব সময় অবজ্ঞা করে চলে। বলে বেড়ায়, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য একমাত্র উপায় ইলমে তরিকতের অনুসারী হওয়া। তাদের প্রচারের ভাব-ভঙ্গিতে সাধারণ লোক মনে করে যে, তারা না জানি ইলমে তরিকত সম্পর্কে

কত বিজ্ঞ। মূলত এরা সে সম্পর্কে কোনোই জ্ঞান রাখে না। তাদের এ কথা যে তাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতা বৈ কিছুই নয়।

★নিজের কল্যাণের স্বার্থে এবং আজাব থেকে রেহাই পেতে যথাসম্ভব কম কথা বল। তুমি তোমার আমলনামার পাতাগুলো আড্ডাবাজি দিয়ে পূর্ণ কর না। কেননা, চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশের দিনে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে তা হলো তোমার জীবনে আল্লাহকে স্মরণ করার মুহূর্তগুলো।

★আপনার বলা কথাগুলোই প্রকাশ করে দিবে আপনার অন্তরের গভীরে কী আছে।

★যখন কোনো বান্দা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তা আসলে কেবল মুখে উচ্চারিত কোনো বিষয় থাকে না, বরং আল্লাহর করুণা ও রহমত প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা স্বীকার অন্তর থেকেও করা হয়।

মায়ের প্রভাব

সন্তানের ওপর মায়ের প্রভাবই থাকে সবচেয়ে বেশি। যে কারণে সন্তান যাতে সু-সন্তান হয়ে গড়ে ওঠে তা একমাত্র মায়ের পক্ষেই নিশ্চিত করা সম্ভব। মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বুজুর্গ হিসেবে হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর গড়ে ওঠার পেছনে মায়ের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। বলা হয়, হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন তাঁর পুণ্যময়ী জননী কুরআন শরিফ তেলাওয়াত করতেন। মাতৃগর্ভে থাকা শিশু তা মুখস্থ করে ফেলতেন। এভাবে তিনি মায়ের গর্ভে থাকাবস্থায় পবিত্র কুরআন শরিফের একটা বড় অংশ মুখস্থ করে ফেলেন। জন্মের পরই তাঁর বাবা ইন্তেকাল করেন। পুণ্যময়ী মা-ই তাকে লালন-পালন এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করেন। সে শিক্ষার কারণেই পরবর্তী জীবনে উন্নতি সাধনে সক্ষম হন। মমতাময়ী জননী তাঁকে সদা সত্য কথা বলতে শিখিয়েছেন। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য মা তাকে বাগদাদের উদ্দেশে পাঠান। মায়ের কারণেই জগদ্বিখ্যাত বুজুর্গ হতে পেরেছিলেন তিনি। স্রষ্টার চূড়ান্ত দীদার লাভের উদ্দেশ্যে গাউসুল আজম হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (র) ১১ রবিউস সানি ৫৬১ হিজরি রোজ সোমবার ইহজগত ত্যাগ করেন। বর্তমানে ইরাকের বাগদাদ শহের তাঁর মাজার শরিফ অবস্থিত।♦

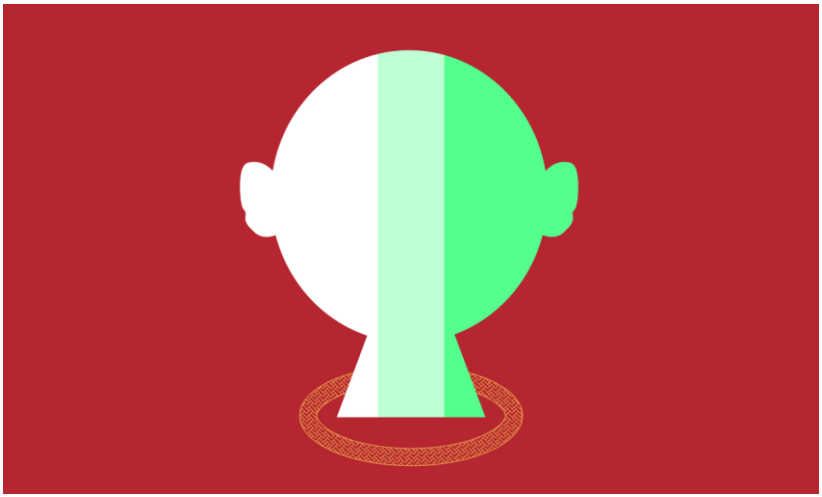

হিজড়া জনগোষ্ঠী ও ইসলামী শরীয়তের নির্দেশনা

মুফতী মো. আবদুল্লাহ্

প্রসঙ্গ: বেশ কিছুদিন যাবত হিজড়াদের বিষয়ে নানা কথা, নানা প্রশ্ন শোনা যাচ্ছে। বিশেষ করে রাস্তাঘাটে, যানবাহনে তাদের চাঁদা দাবি এবং বিশেষ করে পাড়া-মহল্লার বাসায়-বাসায় জোরপূর্বক ঢুকে পড়ে বাচ্চা-শিশুদের কোলে তুলে নিয়ে নাচানাচি এবং দু'হাজার থেকে দশ-পনের হাজার টাকা পর্যন্ত চাঁদা দাবি করে বসা; না দিলে বা কালবিলম্ব করলে তাৎক্ষণিক অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি এমনকি কাপড়-চোপড় খুলে ফেলাসহ হেন কোনো অপকর্ম নেই যা তারা করে না।

সংশ্লিষ্ট হানা-দেওয়া বাড়ি-ঘরের মালিক বা গৃহিনিদের কাছে বাস্তবে তাদের দাবিকৃত অর্থ থাকুক চাই না থাকুক, তাদের কাছে ছাড় বলতে কিছু নেই। প্রতিবেশির কাছ থেকে বা পাশের ফ্লাট থেকে বা পার্শ্ববর্তী বাড়ি থেকে ধার-কর্জ করে হলেও, তাদের দাবিকৃত অর্থ অবশ্যই দিতে হবে; নতুবা কোনোভাবেই

নিস্তার নেই। এ যে, কত বড় বাস্তবতা এবং কত নির্মম নির্যাতন তা ভুক্তভোগি ব্যতীত আর কাউকে বলে বুঝানো যাবে না! অবশ্য রাস্তাঘাটে বা যানবাহনে তারা জোরাজুরি তুলনামূলক কম করে থাকে। যে-কারণে বাইরের সাধারণ জনগণ তাদের রুদ্রমূর্তি ও বাস্তব আচরণ বিষয়ে তেমন ওয়াকিফহাল নয়।

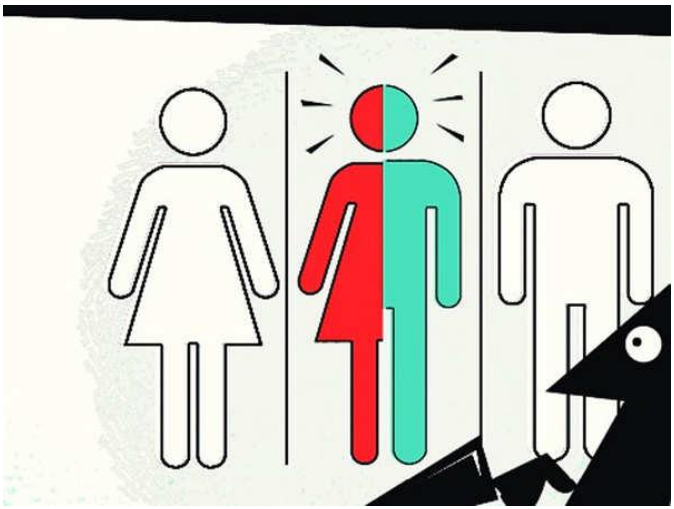

অনেকে প্রশ্ন করে থানা-পুলিশ এদের ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নেয় না কেন? পার্শ্ববর্তী কেউ জবাব দিয়ে দেয়, এদের কাছে থানা-পুলিশও অসহায়। তাই সংশ্লিষ্টরা মামলা-মুকাদ্দমা করলেও তা গৃহীত হয় না। যে-কারণে ভুক্তভোগিরাও নীরবে সহ্য করে যায়! নির্যাতিত হয়েও কারো কাছে সাহায্য কামনার হাত প্রসারিত করতে পারে না বা করে না।

অবশ্য ইদানিং অনেকেই আবার প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন, হুজুর! এরা তো দেখতে বেশ তাগড়া ও সুস্থ-সবল মনে হয়; তা হলে এরা কাজকর্ম করতে পারে না? আবার কেউ কেউ প্রশ্ন করে, আয়-উপার্জন, জায়গা-জমি-সম্পদ, দায়-দায়িত্ব ও উত্তরাধিকার বিষয়ে ইসলামী শরীয়তে কি এদের ব্যাপারে কোনো কিছু নেই?

এ ছাড়া, কিছুদিন পূর্বে সরকারী একটি সমাজসেবা অফিস থেকে হিজড়াদের মৃত্যু-পরবর্তী সৎকার, কাফন-দাফন বিষয়েও জানতে চেয়ে একটি আবেদন এসেছিল। এ সব প্রশ্ন ও আবেদনের জবাব দিতে গিয়ে বিবেকের তাড়া খেয়ে, পর্যায়ক্রমে এদের ব্যাপারে শরীয়তে কোথায় কি নির্দেশনা রয়েছে, তা যথাসাধ্য সাজিয়ে-গুছিয়ে একত্র করার এ প্রয়াস।

মহান আল্লাহর সৃষ্টি হিজড়া নামক এ জনগোষ্ঠী, যারা আমাদের মতোই 'শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি' মানবজাতিরই একটি অংশ। তাই শরীয়তসম্মত সঠিক নির্দেশনার আলোকে এদেরকে প্রকৃত মুসলমান হতে সাহায্য করা এবং রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে জনবল হিসাবে যেন কাজে লাগানো যায়, সেই লক্ষ্যে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসার তাওফিক দিন। আমীন!

সংজ্ঞা ও শ্রেণি

বাংলা ভাষায় পরিচিত 'হিজড়া'-কে শরীয়ত তথা কুরআন, হাদীস ও ফিকহের ভাষায় বলা হয় 'খুনছা' (হিজড়)। আভিধানিক অর্থে আরবী 'খুনছা' শব্দটির মাছদার বা মূলধাতু হচ্ছে 'আত-তাখান্নুছ', যার বাংলা অর্থ হচ্ছে, নরম হওয়া, দুর্বল হওয়া, ভেঙ্গে পড়া, ত্রুটিযুক্ত হওয়া। খুনছা-কে খুনছা বলার কারণ হচ্ছে, সে পুরুষের তুলনায় ভঙ্গুর হয়, দুর্বল হয়, ত্রুটিযুক্ত হয়। আবার নারীর তুলনায় তার অবস্থা কিছুটা উন্নত হয়। কারণ, তার পুরুষ ও নারী উভয়সুলভ লিঙ্গ সংযুক্ত থাকে (আল-মুসতালাহাত ওয়াল-আলফাযুল ফিকহিয়্যাঃ খ-২, পৃ-৫৯, মিসর)।

'তাখান্নুছ' মানে 'মেয়েলী আচরণ করা, মেয়েলী স্বভাবসম্পন্ন হওয়া'; (আল-মু'জামুল ওয়াফীঃ পৃ-২৬৪)। আল্লামা যয়নুদ্দীন ইবন নুজাইম মিসরী (র) বলেন, 'নিহায়া' গ্রন্থের ভাষ্য হচ্ছে, গ্রন্থকার ('কান্য' প্রণেতা) যখন একটি অঙ্গবিশিষ্ট নারী ও পুরুষের বিধান আলোচনা শেষ করলেন তখন তিনি দু'অঙ্গ সম্বলিতদের বিধান আলোচনা শুরু করলেন" (আল-বাহরুর রায়িকঃ খ-৮, পৃ-৩৩৪, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত)। –এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, সাধারণত হিজড়া'দের লজ্জাস্থানকেন্দ্রিক দু'টি অঙ্গই হয়ে থাকে।

পারিভাষিক অর্থে 'হিজড়া' হচ্ছে এমন মানুষ যার পুরুষের অনুরূপ পুরুষাঙ্গ এবং নারীর অনুরূপ গুপ্তাঙ্গ বিদ্যমান অথবা বাস্তবে এদের কারো অনুরূপই নয় বরং তার একটি ছিদ্র বিদ্যমান যা পুরুষ-নারী কারো অনুরূপই নয়"(আল-মুসতালাহাত ওয়াল-আলফাযুল ফিকহিয়্যাঃ খ-২,পৃ-৬০)।

মুফতী আমীমুল ইহসান মুজদ্দেদী বারাকাতী (র) হিজড়ার সংজ্ঞা বিষয়ে লিখেন– 'খুনছা' শব্দটি 'খানাছা' হতে নির্গত, মানে দুর্বলতা, কোমলতা। শরীয়তের পরিভাষায় এমন ব্যক্তিকে 'হিজড়া' বলা হয় যার পুরুষ ও নারী উভয়বিধ গুপ্তাঙ্গ রয়েছে; কিংবা তার কোনোটিই নেই। আর 'জটিল হিজড়া' বলতে, সে মানুষকে বুঝানো হয় যাকে পুরুষ ও নারী কোনো দিকেই প্রাধান্য দেওয়া যাচ্ছে না" (কাওয়াইদুল ফিকহিঃ পৃ-২৮২, আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত)।

সাবালক পূর্ববর্তী অবস্থা

যেক্ষেত্রে তার পুরুষ ও নারী উভয়সুলভ গুপ্তাঙ্গ থাকে সেক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে সে কোনটি দ্বারা প্রস্রাব করে? যদি পুরুষাঙ্গ দ্বারা পেশাব করে তা হলে তাকে ছেলে বলে গণ্য করা হবে। আর যদি নারীসুলভ গুপ্তাঙ্গ দ্বারা পেশাব করে তা হলে তাকে মেয়ে বলে গণ্য করা হবে। কেননা, তেমন পরিস্থিতিতে এটাই দলীলস্বরূপ ধর্তব্য হবে যে, যা দ্বারা পেশাব নির্গত হচ্ছে তা-ই মূল অঙ্গ, অন্যটি রোগ-সমস্যা।

আর যেক্ষেত্রে পুরুষ-নারী কোনো সুলভ অঙ্গই না থাকে; কেবল ছিদ্র দ্বারা পেশাব করে থাকে। পুরুষ বা নারী হিসাবে চিহ্নিত করার মতো অপর কোনো চিহ্ন প্রকাশ না পায় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হিজড়াকে 'খুনছা-মুশকিল' বা জটিল হিজড়া বলা হয়। এমন সমস্যা সাধারণত ছোট বয়সের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে; যা বয়-সন্ধিকালে আর অবশিষ্ট থাকে না (আল-মুসতালাহাত ওয়াল-আলফাযুল ফিকহিয়্যা: খ-২,পৃ-৫৯, মিসর)।

সাবালক পরবর্তী অবস্থা

অবশ্য যখন সাবালক হয়ে যায় তখন অপরাপর নিদর্শন দ্বারা উক্ত জটিলতা দূরীভূত হয়ে যায়। সেসব নিদর্শন হচ্ছে, হয়তো তার দাড়ি-মোচ ইত্যাদি গজাবে; সুতরাং তখন তাকে পুরুষ বলা হবে; কিংবা তার স্তন বড় হবে তখন তাকে নারী বলা হবে।

'সিরাজিয়্যা' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, "যদি নারীদের অনুরূপ তার স্তন প্রকাশ পায় বা তার মাসিক হয় বা তার সঙ্গে সহবাস করা যায়, তা হলে সে নারী বলে গণ্য হবে" (প্রাগুক্ত: পৃ-৬০)।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে হিজড়াদের উত্তরাধিকার প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করে হলে তিনি উত্তরে বললেন, 'তাদের পেশাবের স্থান বিবেচনায় তা নির্ধারিত হবে' ('দারেমী' সূত্রে প্রাগুক্ত: খণ্ড-০২/৪৬১)।

উক্তরূপ বর্ণনা হযরত আলী (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। ইসলাম-পূর্ব জাহেলিয়া যুগেও তাদের ক্ষেত্রে তেমন বিধানই প্রচলিত ছিল; তাই ইসলামও তা-ই বহাল রেখেছে (প্রাগুক্ত: পৃ-৬০)।

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত আলোচনার প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, বাস্তবে হিজড়াদের তিনটি শ্রেণি বিদ্যমান: ১. পুরুষ হিজড়া ২. নারী হিজড়া ও ৩. জটিল হিজড়া।

আরব-অনারব দেশে দেশে হানাফী মাযহাবের সর্বাধিক প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য আইনী গ্রন্থ 'আদদুরুল মুখতার+শামী'-তে কি রয়েছে, তা এ পর্যায়ে লক্ষ্য করি–

"আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি আদম-সন্তানদের নারী-পুরুষ দু'ভাগে সৃষ্টি করেছেন (নিসা : ০১ ও সূরা : ৪৯)। তাদের উভয়শ্রেণির বিধি-বিধানও তিনি বর্ণনা করেছেন। অথচ হিজড়াদের বিষয়ে তেমন প্রত্যক্ষ ও পৃথক কিছু বয়ান করেননি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একজন মানুষ একই সঙ্গে নারী-পুরুষ বিপরীতমুখী উভয় গুণে-বিশেষণে অভিহিত হতে পারে না। তার মাঝে নারী বা পুরুষ সুলভ তথা তেমনটির পরিচায়ক কোনো চিহ্ন-সংকেত অবশ্যই থাকবে। যদিও তা কখনও কখনও চিহ্নিত করতে সংশয় হতে পারে" (প্রাগুক্ত: গায়াতুল-আওতার: খণ্ড-৪, পৃ-৪৯৫; এইচএম সাঈদ কোং, করাচী/ শামী: খ-১০, পৃ-৪৪৬, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত)।

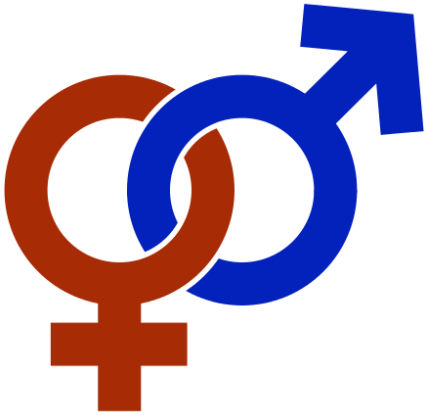

প্রযোজ্য বিধানাবলি

আল্লামা শামী (র)-এর উক্ত বর্ণনা থেকে এটিও বোঝা যাচ্ছে, যে-ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হিজড়া পুরুষরূপে চিহ্নিত হবে সে-ক্ষেত্রে সে পুরুষ হিসাবে নামায-রোযা পালন করবে; উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। আর যে-ক্ষেত্রে নারী হিসাবে চিহ্নিত হবে সে-ক্ষেত্রে তার ওপর একজন নারীর অনুরূপ নামায-রোযা, উত্তরাধিকারের বিধান প্রযোজ্য হবে।

"হিজড়া হচ্ছে সে ব্যক্তি যার নারী ও পুরুষ উভয়সুলভ গুপ্তাঙ্গ বিদ্যমান; কিংবা তেমন কোনোটিই নেই। সে যদি পুরুষাঙ্গ দিয়ে পেশাব করে, তা হলে পুরুষ; আর যদি নারীসুলভ গুপ্তাঙ্গ দ্বারা পেশাব করে তা হলে সে নারী বলে গণ্য। আর যদি এমন হয় যে, উভয় অঙ্গ দ্বারাই পেশাব করে; তা হলে সেক্ষেত্রে প্রথমে যেটি দিয়ে পেশাব বের হবে সেটিই মূল হিসাবে ধর্তব্য হবে; অন্যটি হবে অতিরিক্ত ও অনুগামী। আর যদি উভয়টি দিয়ে একই সময়ে পেশাব বের হয় তা হলে সেক্ষেত্রে তাকে বলা হবে 'জটিল হিজড়া'। কারণ, তার ব্যাপারে নারী বা

পুরুষ কোনো একদিক নির্দিষ্ট করা গেল না। আর এমনটি হয়ে থাকে সাবালক হওয়ার পূর্বে।

পরে যখন সাবালক হলো এবং তার দাঁড়ি গজালো অথবা সে কোনো নারীর সঙ্গে সহবাস করতে সক্ষম হলো অথবা তার পুরুষের অনুরূপ স্বপ্নদোষ হলো, তা হলে সে পুরুষ বলে গণ্য হবে। আর যদি তার স্তন প্রকাশ পায় বা দুধ বের হয় বা মাসিক হয় বা গর্ভ সঞ্চারিত হয় বা তার সঙ্গে সহবাস করা সম্ভব হয়; তা হলে তাকে নারী বলে গণ্য করা হবে।

আর যদি তার (সাবালক হওয়ার পরেও) উক্ত কোনো নিদর্শনই প্রকাশ না পায় কিংবা নিদর্শনগুলো পরস্পর বৈপরিত্যের প্রমাণ বহন করে এবং কোনো একদিকের নিদর্শনকে প্রাধান্য দেওয়া না যায়; তা হলে সেক্ষেত্রে তাকে 'জটিল হিজড়া' বলা হবে" (গায়াতুল-আওতার: খ-৪, পৃ-৪৯৬; এইচএম সাঈদ কোং, করাচী)।

উক্ত উদ্ধৃতি থেকে নতুন করে আমরা– ১. নারী ও পুরুষ হিজড়া নির্ধারণের প্রক্রিয়া ২. সাবালক হওয়ার পরও জটিল হিজড়া'র অস্তিত্ব এবং ৩. হিজড়ার বেলায় অহিজড়া মুসলিমদের অনুরূপ নামায-রোযা ও উত্তরাধিকারের বিধান প্রয়োগ করা– এই তিনটি বিষয় পেলাম।

বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে (২০০০ খ্রি. মোতাবেক ১৪২০ হি) বায়রুত ও দামেশক থেকে একযোগে প্রকাশিত, হানাফী মাযহাবকে নতুন আঙ্গিকে সাজানো-গোছানো গ্রন্থ 'আল-ফিকহুল হানাফী ফী ছাওবিহিল-জাদীদ' গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড, ২৭২ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞ আলেম ও ফকীহ্ গ্রন্থকার আল্লামা আবদুল হামিদ মাহমূদ তুহমান 'জটিল হিজড়া' প্রসঙ্গে লিখেছেন–

"যদি আদতেই তার কোনো নিদর্শন প্রকাশ না পায় অথবা নিদর্শনগুলোর মধ্যে বৈপরিত্য দেখা যায়, তা হলে সে হবে 'খুনছা মুশকিল' তথা জটিল হিজড়া। আর সাবালক হওয়ার পর তেমন হিজড়া বাস্তবে অনেক কমই পাওয়া যায়। বিশেষ করে আমাদের বর্তমান সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পাওয়া যাওয়ার কারণে এটি একেবারে সহজ যে, তাঁরা এক্স-রে, বিভিন্ন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং তার অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ও ব্যতিক্রমী অঙ্গটি অপারেশনের দ্বারা কেটে ফেলতে পারেন ('আল-ফিকহুল হানাফী ফী ছাওবিহিল-জাদীদ', দ্বিতীয় খণ্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা, কাহেরা, মিসর)।

উক্ত 'জটিল হিজড়া'র ব্যাপারে, তার নারী/পুরুষ বিষয়টি স্থিরীকৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, তার ক্ষেত্রে সকল বিধি-বিধানে সতর্কতার দিকটি প্রযোজ্য হবে। সম্পদ বন্টন প্রশ্নে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর গবেষণাপ্রসূত মতানুযায়ী

তাকে ছোট অংশটি দেওয়া হবে। তার প্রক্রিয়া হবে: তাকে পুরুষ গণ্য করলে তার অংশ কত হয় এবং নারী বলে গণ্য করলে তার অংশ কত হয়? তা বিবেচরা করতে হবে এবং তার পর তাকে সে হিসাবে ছোট অংশটি প্রদান করা হবে। আর উক্ত উভয়বিধ বিবেচনা কালীন কোনো ক্ষেত্রে সে যদি (ফারায়েয শাস্ত্রের 'হিজাব') প্রতিবন্ধকতার দরুণ বঞ্চিত হয়; তা হলে সে কোনো অংশ পাবে না।

'সাহেবাইন' (ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ) র. বলেন: তাকে পুরুষ ও নারী কল্পনা করলে উভয়টির সমষ্টি যা হবে তার অর্ধেক প্রদান করা হবে। কিন্তু 'ফাতাওয়া' (চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত) হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত অনুযায়ী। আর তাই হচ্ছে, সকল সাহাবীরও অভিমত" ('আল-ফিকহুল হানাফী ফী ছাওবিহিল-জাদীদ' : দ্বিতীয় খন্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা; কাহেরা, মিসর)।

–উক্ত উদ্ধৃতি থেকেও লক্ষণীয়:

১. সমস্যা কেবল 'জটিল হিজড়া'র ক্ষেত্রে; যে-হিজড়া নারী বা পুরুষরূপে চিহ্নিত হয়ে গেছে তার ক্ষেত্রে জটিলতার কিছু নেই। যে-কারণে সে স্বাভাবিক নারী-পুরুষের অনুরূপই সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে এবং তার মৃত্যুজনিত কারণে তার ওয়ারিশরাও অন্যদের অনুরূপ বিধি মোতাবেক তার উত্তরাধিকারী হবে।

২. সমাজ-সংসার ও রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য থাকলে এক সময় 'জটিল হিজড়া'ও জটিল থাকবে না এবং তাদের ব্যাপারেও বৈষম্যহীন আইনী সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়ে যাবে।

৩. ইতিপূর্বে 'বাহরুর রায়িক' সূত্রে আলোচিত বিষয়টি অর্থাৎ 'হিজড়া'দের প্রাপ্য অংশ ঘিরে ব্যাপক যে-আলোচনা বা অভিমতের প্রসঙ্গ বিভিন্ন কিতাবে বিদ্যমান তা কেবল জটিল হিজড়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; অন্য দু'প্রকার হিজড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যে-কারণে এ বিজ্ঞ গ্রন্থকার অপরাপর সব বক্তব্য এড়িয়ে গেছেন।

৪. এমনকি হানাফী মাযহাবের বিজ্ঞ ইমামদের আরও যেসব 'তাফসীলী অভিমত' রয়েছে তা-ও তিনি পরিহার করে কেবল সংক্ষেপে ইমাম আ'যম (র) ও সাহেবাইন-এর অভিমত উল্লেখ করে, সর্বশেষ ও স্থিরিকৃত চুড়ান্ত সিদ্ধান্তটিও জানিয়ে দিলেন। সুতরাং শরীয়া আইন ও গবেষণার 'উসূল' (মূলনীতি/নীতিমালা) মোতাবেক এসব নিয়ে নতুন করে গবেষণার কিছুই নেই।

৫. কুরআন-সুন্নাহ্, সাহাবাগণের আমল, চার মাযহাবের গবেষক ইমামদের যুগে ও পরবর্তী যুগে ধর্মবিশেষজ্ঞগণ –বিশেষত শরীয়া আইনবিশেষজ্ঞ আলেম গ্রন্থকারগণ আলোচ্য বিষয়টিসহ অপরাপর সব বিষয়েই এতো

অধিক পরিমাণে অনুসন্ধান ও অনুপুঙ্খ আলোচনা করে গেছেন যে, বর্তমানে আর নতুন করে এসব ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের কিছু নেই– এই অর্থে যে, আমরা আরও হাজার বছর গবেষণা করেও তাঁরা যা কিছু রেখে গেছেন, তার বাইরে নতুন কিছু দিতে পারবো না। নতুন কিছু দেওয়া তো পরের কথা; আমরা তো তাঁরা যা যা গুছিয়ে দিয়ে গেছেন এবং কোন্ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কি, চিহ্নিত করে দিয়ে গেছেন– তাও খুঁজে বের করতে হিমশিম খেয়ে থাকি!

হিজড়া জনগোষ্ঠীর কাফন-দাফন ও উত্তরাধিকার

কাফন-দাফন, গোসলদান ও জানাযা পড়া ইত্যাদি সকল বিধানেই হিজড়ারা সমান অধিকার ও সেবাপ্রাপ্তি প্রশ্নে অহিজড়া মুসলমানদের অনুরূপ। একজন মুসলিম নর বা নারী হিসাবে মুসলিম সমাজের কাছে তেমন সমান আচরণ প্রাপ্তি তাদের হক–অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

১। উত্তরাধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেমন সংশ্লিষ্ট হিজড়াকে পুরুষ গণ্য করা হবে, না কি নারী? সেক্ষেত্রে যেমন বলা হয়েছে যে, যদি তার সৃষ্টিগত বাহ্যিক অবস্থা ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা– উদাহরণত, দাড়ি-মোচ গজানো, পুরুষের অনুরূপ আচরণ এবং পুরুষের অনুরূপ বা তার কাছাকাছি প্রস্রাবের স্থান অথবা তার দ্বারা কোন নারীর গর্ভ সঞ্চারিত হওয়া; কিংবা নারীসুলভ আচরণ, স্তন-গুপ্তাঙ্গ নারীদের অনুরূপ বা কাছাকাছি হওয়া অথবা তার মাসিক স্রাব হওয়া, ইত্যাদি লক্ষণীয় হয় এবং পুরুষ বলে ধর্তব্য হয়; তা হলে একজন অহিজড়া মুসলিম পুরুষের সমপরিমাণ অংশ সেও পায়। আর নারী বলে ধর্তব্য হলে, একজন অহিজড়া মুসলিম নারীর সমপরিমাণ অংশ একজন হিজড়া নারীরও প্রাপ্য; যদিও ক্ষেত্রবিশেষে অর্থাৎ কেবল 'জটিল হিজড়া'র ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। ঠিক তেমনি গোসল ও কাফন-দাফনে নারী বা পুরুষ নির্ধারণ করে; এবং জেনে নিয়ে অর্থাৎ নারী হলে অন্য কোন নারীই তাকে গোসল দেবে এবং ৩ কাপড়ের স্থলে ৫ কাপড় দেয়া হবে (আদ-দুররুল মুখতার+রাদ্দুল মুহতার : খণ্ড-৩, পৃ-৯৯, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত)।

আর যদি পুরুষ গণ্য করা হয় তাহলে তাকে অন্য কোন পুরুষই গোসল দেবে এবং তিন কাপড়ে কাফন দিয়ে, জানাযা পড়ে, দাফন করতে হবে। কোনরূপ বৈষম্য করা হবে না। অবশ্য যে- হিজড়াকে নারী বা পুরুষরূপে নির্ধারণ করা যাচ্ছে না তথা 'জটিল হিজড়া', তাকে সতর্কতামূলক নারীর অনুরূপ পাঁচ কাপড়ে দাফন করা যেতে পারে; যদিও তিন কাপড়ে দাফন করাও জায়েয আছে।

২। মৃত হিজড়া যদি চার বছর বয়সী বা কমবেশি বয়সের এমন শিশু হয় যে, তার প্রতি স্বভাবজাত আকর্ষণ জন্মে না তাহলে তাকে নারী পুরুষ যে কেউ গোসল

দিতে পারবে (আহসানুল ফাতওয়া : খ-৪, পৃ- ২২১ ; যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত)।

৩। মৃত হিজড়া যদি এমন হয় যে, তাকে নারী বা পুরুষ কোনো দিকেই প্রাধান্য দেয়া যাচ্ছে না তাহলে সেক্ষেত্রে সে সাবালকের কাছাকাছি হোক বা সাবালক হোক; তাকে তায়াম্মুম করিয়ে, কাফন পরিয়ে জানাযা দিয়ে কবরস্থ করা হবে (আদদুররুল মুখতার+রাদ্দুল মুহতার ঃ খণ্ড-৩, পৃ-৯৪-৯৫, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত+ আল-বাহরুর রায়িক : খণ্ড-২, পৃ-৩০৫, ৩১১; যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত)।

৪। জানাযার দু'আর ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত নিয়মে নারী-পুরুষ জেনে নিয়ে দু'আ পড়বে। আর মৃতটি যদি না-বালক হয় এবং ছেলে বা মেয়ে নির্ধারণ জটিল হয় তাহলে শিশুদের ক্ষেত্রে বর্ণিত দু'আর যে কোনটি পড়লেই যথেষ্ট হবে (আহসানুল ফাতাওয়া : খ-৪, পৃ-২০২, ২২১ ; যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত)।

উপসংহার: উপরিউক্ত বিস্তারিত আলোচনা থেকে সহজেই অনুমেয় যে, ইসলামী শরীয়তে 'আশরাফুল- মাখলুকাত' মানবজাতির ছোট একটি অংশ হলেও, আলোচ্য হিজড়াদের ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান। যে-কারণে খোদ হিজড়াদের নিজেদের বেলায় দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন হওয়ার পাশাপাশি ধর্মীয় নের্তৃবৃন্দেরও ধর্মীয় কর্তব্য বর্তায়, হিজড়াদের সংশ্লিষ্ট পরিবার-স্বজনদের, জনগণকে, সমাজ ও রাষ্ট্রকে এদের বিষয়ে সচেতন ও উৎসাহিত করা। যেন সবাই এদের সঙ্গে অপর দশজনের অনুরূপ সদ্ব্যবহার ও মানবিক আচরণ করে; এদের বিয়ে-শাদী, ঘর- সংসার, আয়-উপার্জন, সামাজিকতা, ইবাদত-বন্দেগী, মৃত্যু-পরবর্তী সম্মানজনক কাফন-দাফন-জানাযায় সকলেই সহযোগিতা করতে পারে। বিশেষ করে এরা যেন ভবঘুরে হয়ে রাস্তায় রাস্তায় চাঁদাবাজি বা হাতপাতা কিংবা বাসা-বাড়িতে হানা দিয়ে সংশ্লিষ্টদের উত্যক্ত না করে; বরং অন্য দশজনের অনুরূপ প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্য কাজ-কর্ম ও পেশায় নিয়োজিত হয়ে সম্মানজনক জীবিকা এবং সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হতে পারে– তেমন সার্বিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে আমাদের সকলকে শরীক হতে হবে। তার পাশাপাশি রাষ্ট্র ও প্রশাসনকেও এদের সার্বিক কল্যাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে হিজড়াদের কল্যাণে এগিয়ে আসার তাওফিক দিন। আমীন! ♦

লেখক : মুফতী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

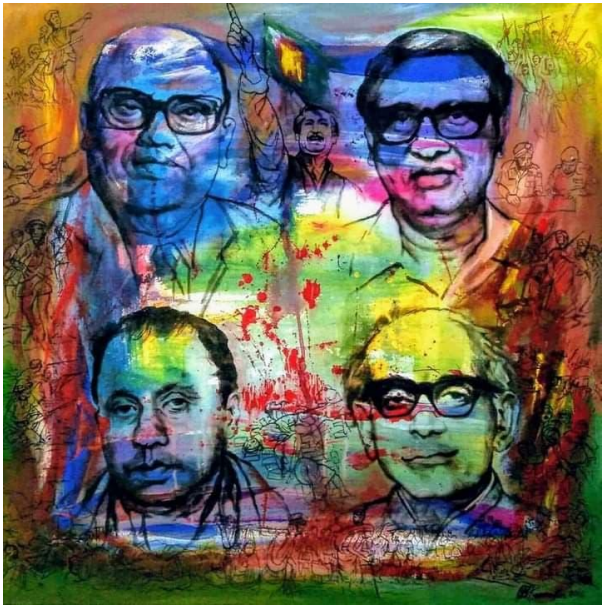

জেল হত্যা
ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়

শামস সাইদ

১৫ আগস্টের পরে ইতিহাসের আরও একটি কলঙ্কময় অধ্যায় জেল হত্যা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অনুপস্থিতিতে যারা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন– সেই সূর্য সন্তানদের হত্যার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে নেতৃত্বশূন্য করার আরেকটি প্রচেষ্টা। যাঁদের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে ধ্বনিত হতো বাংলাদেশ নাম– সেই চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামরুজ্জামান।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করেও বিশ্বাসঘাতকরা নিরাপদ ভাবতে পারেনি নিজেদের। তারা বুঝতে

পেরেছিল এই চার নেতা বেঁচে থাকলে কোনো দিন পার পাবে না তারা। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ও তার আদর্শ বাস্তবায়নে অটুট থাকবেন জাতীয় চার নেতা।

১৯৭৫-এর ৩ নভেম্বর। সোমবার ভোররাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সুরক্ষিত নিরাপদ কক্ষে স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মন্ত্রী এম. মনসুর আলী ও এ.এইচ.এম কামরুজ্জামানকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। এ হত্যাকাণ্ডের ৭৯ দিন আগে '৭৫-এর ১৫ আগস্ট শুক্রবার ভোরে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে ঘাতকরা।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার এক ঘণ্টার মধ্যেই স্বাধীনতাবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত মুজিব মন্ত্রিসভার বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয়। মোশতাক ১৫ আগস্ট হত্যা ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা ও ঘাতক। তবে এই মোশতাক জাতির পিতার সহকর্মী এবং আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা ছিলেন। স্বাধীনতাযুদ্ধকালে প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও ছিলেন চক্রান্তকারী মোশতাক। পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকা অবস্থায় বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির সঙ্গে মিলে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিলেন তিনি। যুদ্ধ চলাকালে তার ষড়যন্ত্রের কথা জানাজানি হয়ে যায়। ফলে একাত্তরের আগস্ট কিংবা সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে খন্দকার মোশতাককে কার্যত অপসারণ করেন। যুদ্ধের শেষ কয়েক মাস মোশতাক অনেকটা গৃহবন্দি ছিলেন। যে কারণে '৭১-এ জাতিসংঘ অধিবেশনে প্রেরিত বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন তৎকালীন সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর '৭১-এর ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেশে এসে ১২ জানুয়ারি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। খন্দকার মোশতাককে তাঁর মন্ত্রিসভায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পানিসম্পদমন্ত্রী করেন। চতুর, ধুরন্ধর ও চানক্য খন্দকার মোশতাক এবং তার সহযোগীরা তখন যুদ্ধকালীন সরকারের মূল নেতা তাজউদ্দীন আহমদের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর কানভারী করতে থাকে। খন্দকার মোশতাক ও স্বাধীনতাবিরোধী একটি বড়ো পরাশক্তির চক্রান্তে ১৯৭৪-এর ২৬ অক্টোবর তাজউদ্দীন আহমদকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়।

পর্যবেক্ষকদের মতে, মন্ত্রিসভা থেকে তাজউদ্দীন আহমদকে সরিয়ে দেয়াটা ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভুল। অসাধারণ

মেধাবী, দেশপ্রেমিক এবং খুবই বিশ্বস্ত ও কাছের মানুষ তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর কাছে থাকলে সহজেই '৭৫-এর ১৫ আগস্টের ষড়যন্ত্র কার্যকর করা সম্ভব হতো না বলেও মনে করেন অনেকে। মুজিব বিরোধী এবং স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি এটা বুঝেই সর্বাগ্রে বঙ্গবন্ধু থেকে তাজউদ্দীন আহমদকে বিচ্ছিন্ন করার কাজটি খুব নিপুণভাবে করেছিল। স্বাধীনতাবিরোধী পরাশক্তি ও পাকিস্তানের ভুট্টোচক্র তাদের এদেশীয় দোসরদের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করেছে। '৭১-এ পাকিস্তানের সেনাবাহিনী জাতির পিতাকে হত্যা করতে পারেনি। স্বাধীন বাংলাদেশে '৭৫ বাঙালি সেনাবাহিনী সেই কাজটি করেছিল। এরা ছিল স্বাধীনতাবিরোধী চক্র। সেই চক্রান্তকারী গোষ্ঠীই জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করে। স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রতিনিধি মোশতাক ও ঘাতক ফারুক-রশীদচক্র ১৬ আগস্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করে ইসলামী প্রজাতন্ত্র রাখার চেষ্টা করেছিল। সেই সঙ্গে তারা চেয়েছিল বাংলাদেশকে পরাজিত পাকিস্তানের আদলে একটি 'মিনি পাকিস্তান' বানাতে। সেই লক্ষ্যেই রাষ্ট্রের স্থপতি মহান নেতা শেখ মুজিব এবং তাঁর বিশ্বস্ত সিপাহসালার চার জাতীয় নেতাকে সুপরিকল্পতভাবে হত্যা করা হয়।

১৫ আগস্ট থেকেই আত্মস্বীকৃত ঘাতক ফারুক-রশীদ ট্যাংক নিয়ে বঙ্গভবনে অবৈধ রাষ্ট্রপতি মোশতাকের সঙ্গে অবস্থান করে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার দিন থেকেই বাংলাদেশ বেতারকে পাকিস্তান স্টাইলে রেডিও-বাংলাদেশ নামকরণ করা হয়। ঘৃণ্য মোশতাক প্রথম ভাষণেই তার মদদদাতা পাকিস্তানি প্রভুদের নির্দেশে জয় বাংলার পরিবর্তে সেই পুরনো পরিত্যক্ত জিন্দাবাদ ধ্বনি চালু করেন। অথচ ১৯৭১ সালে ৩০ লাখ শহীদের তাজা রক্ত এবং ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানের কবরের ওপর অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। যুদ্ধকালীন সম্মুখসমরে মুক্তিযোদ্ধারা জয় বাংলা রণধ্বনি দিয়েই শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। মূলত আমাদের মহান মুক্তি সংগ্রামের রণধ্বনিই ছিল 'জয় বাংলা। একাত্তরেই জয় বাংলার কাছে জিন্দাবাদের কবর রচিত হয়।

ক্ষমতা দখলকারী খুনি মোশতাক-ফারুক-রশীদ চক্র ১৫ আগস্ট থেকেই নিবেদিত প্রাণ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। একশ্রেণীর ভিতু-কাপুরুষ, সুবিধাবাদি বুঝে না বুঝে খুনি মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। সাহসী ও দেশপ্রেমিকরা জাতির পিতার এ হত্যাকাণ্ড মেনে নিতে পারেননি। মোশতাক সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এম. মনসুর আলী ১৫ আগস্ট সকালেই ঘাতকচক্রকে নির্মূল করতে বিমান বাহিনী প্রধান এ কে

খন্দকারসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এ মহান নেতা মোশতাকের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব মুখের ওপর ঘৃণার সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ১৫ আগস্ট সকালেই মনসুর আলী সরকারি বাসভবন ছেড়ে আত্মগোপনে চলে যান। একজন ব্যক্তিগত স্টাফের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ওবায়দুর রহমানের তৎপরতায় গোপন স্থান থেকে বঙ্গভবনে মোশতাকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। ঘাতক মোশতাক প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের আহ্বান জানান। তাঁদের দুজনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল ভালো। হতচকিত মনসুর আলী অবৈধ মোশতাককে বললেন, তুমি শেখ মুজিবকে হত্যা করলে, করতে পারলে'? আবেগে-কান্নায়-ঘৃণায় বুজে এলো তাঁর কণ্ঠ। এরপরও তুমি কীভাবে ভাবলে তোমার মন্ত্রিসভায় আসব আমি!

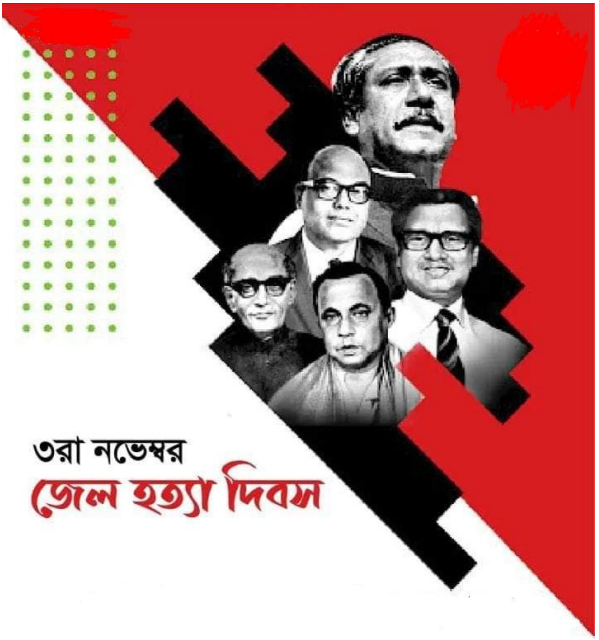

গৃহবন্দি চার নেতাসহ আওয়ামী লীগের ১৯ জনকে ২২ আগস্ট ঢাকা জেলে নেয়া হলো। রাষ্ট্রপতি হিসাবে খন্দকার মোশতাক ক্ষমতায় ছিলেন মাত্র ৮৩ দিন। এই সময়ে শেখ মুজিব সরকারের অনেক কিছু পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি।

আসলে রাষ্ট্রপতির চেয়ারে তাকে বসানো হয়েছিল। খুনীচক্রই তাকে বসিয়েছিল নিজেদের সার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে। অনেকটা শিখণ্ডির মতোই ছিলেন তিনি। তারপরেও তার নেতৃত্বে সরকার পরিচালিত হয়েছে, আর সেই

সরকারের সবাই ছিলেন আওয়ামী লীগের, তারা ১৫ই অগাস্টের আগের ও পরের অনেক কিছুই পাল্টে দিয়েছিলেন তারা। চেষ্টা করেছিলেন মূলত বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাস থেকে ও বাঙালি জাতির হৃদয় থেকে মুছে দিতে।

১৫ অগাস্টের আগ পর্যন্ত বাকশাল ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়ে আসছিল রাষ্ট্র। একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে বাকশালের একদলীয় ব্যবস্থা রদ করেন খন্দকার মোশতাক। অনেকগুলো পত্রিকা বন্ধ হয়েছিল, সেগুলো খোলা শুরু করেন। তৃতীয়ত, ব্যক্তি পুঁজির একটি সিলিং (উর্ধ্বসীমা) ছিল তিন কোটি টাকা পর্যন্ত, সেটা তিনি ১০ কোটি টাকা করেন এবং প্রাইভেটাজাইশনে একটা গতি আনার চেষ্টা করেন।

সাম্প্রদায়িক আবহ, যেটা একাত্তরের পর থেকে বলতে গেলে অনেকটা মুছেই গিয়েছিল সেটা আবার উস্কে দিলেন মোশতাক। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে তার প্রশ্রয়ে একটা নেতিবাচক প্রচারণা চলতে থাকে।

তার ক্ষমতা আরও দীর্ঘায়িত হলে তিনি আরও অনেক কিছু করতেন এটা ধারণা করা অমূলক নয়। তবে তিনি যেই সরকারের অংশ ছিলেন ১৫ আগস্টের আগ পর্যন্ত, ঠিক তার অনেকটাই বিপরীতধর্মী কাজ তিনি ওই সময়ে করেছেন। এখানেই পরিস্ফুটিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ওপর তার ক্ষোভ ও হিংসা।

১৫ আগস্ট যখন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের রক্তের দাগ শুকোয়নি, তখন নিজেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা করেন খন্দকার মোশতাক। রাষ্ট্রপতির আসনে বসেই শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের 'জাতির সূর্য সন্তান' বলে আখ্যা দেন তিনি।

মেজর জেনারেল (অব) মইনুল হোসেন চৌধুরী তাঁর 'এক জেনারেলে নীরব সাক্ষ্য: স্বাধীনতা প্রথম দশক' বইতে লিখেছেন, "শেখ মুজিবের হত্যার পর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা এবং আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য খন্দকার মোশতাক বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নেন। সরকার গঠন করে তিনি 'জয় বাংলা' ধ্বনির স্থলে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' ধ্বনি প্রচলন করেন। বাংলাদেশ বিরোধী ও পাকিস্তানপন্থী কিছু ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদে বহাল করেন। এ সময় স্বাধীনতা বিরোধী চক্র রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অঙ্গনে বেশ তৎপর হয়ে উঠলো।" এই সরকারকে সবার আগে স্বীকৃতি দেয় পাকিস্তান।

১৯৭৫ সালের ২০ আগস্ট খন্দকার মোশতাক সামরিক আইন জারি করলেন এবং নিজেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব নিলেন। ক্ষমতা গ্রহণের সময় প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত করেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ। ফলে

তার সেই সরকারে ১২ জন মন্ত্রী এবং ১১ জন প্রতিমন্ত্রী থাকলেও কোন প্রধানমন্ত্রী পদ ছিল না। নিজে রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণের পরেই উপরাষ্ট্রপতি করেন শেখ মুজিব সরকারের ভূমিমন্ত্রী মোহাম্মদ উল্লাহকে।

গ্রেপ্তার অভিযান

আনোয়ার উল আলম তার 'রক্ষীবাহিনীর সত্য-মিথ্যা' বইয়ে লিখেছেন, 'খন্দকার মোশতাক আহমদ ক্ষমতা গ্রহণ এবং মন্ত্রিসভা গঠন করেই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রেপ্তার করতে থাকেন। ২৩শে আগস্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এ এইচ এম কামারুজ্জামান, এম মনসুর আলী, আবদুস সামাদ আযাদসহ শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে যারা তাকে সমর্থন করতেন এবং তার মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে অস্বীকার করেছেন, তাঁদের বন্দী করেন।'

মেজর জেনারেল (অব) মইনুল হোসেন চৌধুরী 'এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য, স্বাধীনতার প্রথম দশক' বইতে লিখেছেন, 'ক্ষমতায় এসেই খন্দকার মোশতাক তাড়াহুড়ো করে সামরিক বাহিনীতে পরিবর্তন আনে। জেনারেল ওসমানীকে (এমএজি ওসমানী) একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদায় রাষ্ট্রপতির সামরিক উপদেষ্টা করা হলো। উপ-সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান করা হলো। আর পূর্বতন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহকে অব্যাহতি দিয়ে তার চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হলো রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগের জন্য।'

'মেজর রশিদ, ফারুক এবং তাদেরই সহযোগীদের হাবভাব ও চালচলন দেখে মনে হতো, দেশ এবং সেনাবাহিনী তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। মেজর ফারুক বঙ্গভবনের একটি কালো মার্সিডিজ গাড়িতে চড়ে- ঘুরে বেড়াত। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন লোকজনের কাছ থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় এবং অন্যান্য অনিয়মের অভিযোগ ছিল। খন্দকার মোশতাক এদেরকে তার নিজের নিরাপত্তার জন্য বঙ্গভবনেই থাকতে উৎসাহিত করতেন।' লিখেছেন মইনুল হোসেন চৌধুরী।

ক্ষমতা দখল করার পর থেকেই হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তা এবং নতুন সরকারের সদস্যদের জন্য একটি উদ্বেগের কারণ ছিল রক্ষীবাহিনী। তাই অগাস্টেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, রক্ষীবাহিনী বিলুপ্ত করে সামরিক বাহিনীর সাথে একীভূত করে ফেলা হবে। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে খন্দকার মোশতাক আহমেদের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা এম এ জি ওসমানী রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের ডেকে এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন।

জয় বাংলার বদলে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই জয় বাংলা অনেকটা জাতীয় শ্লোগান হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। স্বাধীনতার পরে এই শ্লোগানই ব্যবহৃত হতো। কিন্তু খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নিয়েই তার প্রথম বক্তব্যে 'জয় বাংলা'র বদলে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' বলতে শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ বেতারের নাম পরিবর্তন করে রেডিও পাকিস্তানের অনুকরণে 'রেডিও বাংলাদেশ' নাম নির্ধারণ করেন।

জাতীয় পোশাক

সেই সময়ের পত্রপত্রিকার খবর থেকে জানা যায়, ছয়ই অক্টোবর মন্ত্রিপরিষদে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, রাষ্ট্রীয় পোশাক হবে খন্দকার মোশতাক আহমেদ সবসময়ে যা পরে থাকতেন, সেই আচকান ও শেরওয়ানি। আর মোশতাক যে টুপি মাথায় পরতেন, সেই টুপিকে জাতীয় টুপি ঘোষণা করা হয়।

বলা হয়, গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মকর্তাদের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে এই টুপি ও পোশাক পরে যোগদান করতে হবে।

মাসকারেনহাস তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, ক্ষমতা দখলের পরই মোশতাক, ফারুক ও রশীদ একটি পরিকল্পনা তৈরি করে রাখে। সেটা হচ্ছে অন্য কেউ ক্ষমতা দখল করলে সর্বপ্রথম একটি কিলার গ্রুপ জেলে গিয়ে চার নেতাকে হত্যা করবে। সুবেদার মুসলেমের নেতৃত্বে কিলারদের নামও নির্দিষ্ট করে রাখা হয়।

জেল হত্যা

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মধ্যরাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে একটি পিকআপ এসে থামে। তখন আনুমানিক রাত দেড়টা থেকে দুইটা। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় সে গাড়িতে কয়েকজন সেনা সদস্য ছিল। ঢাকা তখন অস্থিরতার নগরী। সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে অভ্যুত্থান এবং পাল্টা অভ্যুত্থান নিয়ে নানারকম কথা শোনা যাচ্ছে। সে সময় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জেলার হিসেবে কর্মরত ছিলেন আমিনুর রহমান।

রাত দেড়টার দিকে কারা মহাপরিদর্শক টেলিফোন করে জেলার আমিনুর রহমানকে তাৎক্ষণিকভাবে আসতে বলেন। দ্রুত কারাগারের মূল ফটকে গিয়ে তিনি দেখলেন, একটি পিকআপে কয়েকজন সেনা সদস্য সশস্ত্র অবস্থায় বসে আছে।

মূল ফটকের সামনে সেনা সদস্যরা কারা মহাপরিদর্শককে একটি কাগজ দিলেন। সেখানে কী লেখা ছিল সেটি অবশ্য জানতে পারেননি আমিনুর রহমান। মূল ফটক দিয়ে ঢুকে বাম দিকেই জেলার আমিনুর রহমানের কক্ষ। তখন সেখানকার টেলিফোনটি বেজে উঠল। টেলিফোনের রিসিভারটি যখন তুললেন, তখন অপর প্রান্ত থেকে বলা হলো প্রেসিডেন্ট কথা বলবেন।

একটি সাক্ষাৎকারে আমিনুর রহমান বলেন, 'টেলিফোনে বলা হলো প্রেসিডেন্ট কথা বলবেন আইজি সাহেবের সাথে। তখন আমি দৌড়ে গিয়ে আইজি সাহেবকে খবর দিলাম। কথা শেষে আইজি সাহেব বললেন যে প্রেসিডেন্ট সাহেব ফোনে বলছেন আর্মি অফিসাররা যা চায়, সেটা তোমরা কর।'

মূল ফটকের সামনে কথাবার্তা চলতে থাকে। এক সময় রাত তিনটা বেজে যায়। এক পর্যায়ে কারাগারে থাকা আওয়ামী লীগের চারজন নেতাকে একত্রিত করার আদেশ আসে। কারা মহাপরিদর্শক একটি কাগজে চার ব্যক্তির নাম লিখে জেলার আমিনুর রহমানকে দিলেন। সেই চারজন হলেন– সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং এএইচএম কামরুজ্জামান। আমিনুর রহমানের বর্ণনা অনুযায়ী সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দীন আহমদ কারাগারের একটি কক্ষে ছিলেন। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং এএইচএম কামরুজ্জামানকে অপর কক্ষ থেকে এখানে নিয়ে আসা হয়। সেখানে আসার আগে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী কাপড় পাল্টে নিলেন।

তাজউদ্দীন আহমদ তখন কুরআন শরীফ পড়ছিলেন। তারা কেউ জিজ্ঞেস করলেন না আমাদের কোথায় নেয়া হচ্ছে? সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব হাত-মুখ ধুলেন। আমিনুর রহমান বললেন, আর্মি আসছে। চারজনকে যখন একটি কক্ষে একত্রিত করার ক্ষেত্রে কিছুটা সময় লাগার কারণে সেনাসদস্যরা কারা কর্মকর্তাদের নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করছিল। মনসুর আলি সাহেব বসা ছিলেন সর্ব দক্ষিণে। মনসুর আলীর 'ম' কথাটা উচ্চারণ করতে পারেননি। তার আগেই গুলি শুরু করল ওরা।'

কারাগারের ভেতর এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর চার নেতার পরিবার সেদিন জানতে পারেননি। তাজউদ্দীন আহমদের পরিবার কারাগারের খোঁজ নেবার জন্য সারাদিন চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। পরের দিন অর্থাৎ ৪ নভেম্বর পুরনো ঢাকার এক বাসিন্দা তাজউদ্দীন আহমদের বাসায় এসে জানান যে তিনি আগের দিন ভোরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গুলির শব্দ শুনেছেন।

তাজউদ্দীন আহমদের মেয়ে সিমিন হোসেন রিমি এক সাক্ষাতকারে বলেন, ৪ নভেম্বর বিকেল চারটার দিকে খবর আসতে শুরু করলো তাজউদ্দীন আহমদসহ চারজন নেতাকে হত্যা করা হয়েছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানকে প্রায় সপরিবারে হত্যার ঘটনার সাথে জেল হত্যাকাণ্ডের যোগসূত্র আছে বলে মনে করেন তাজউদ্দিন কন্যা।

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের বিপরীতে পাল্টা আরেকটি অভ্যুত্থান হয়েছিল ৩ রা নভেম্বর। সেটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ। আমিন আহমেদ চৌধুরীর মতে, তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থানটি ছিল অনিবার্য। কারণ শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছয়জন জুনিয়র সেনা কর্মকর্তা তখন বঙ্গভবনে বসে রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাককে পরিচালনা করছিলেন। শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছয়জন জুনিয়র সামরিক কর্মকর্তাকে সেনাবাহিনীর চেইন অব কমাণ্ডের আওতায় আনার জন্য তেসরা নভেম্বর খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন জেনারেল চৌধুরী।

তাছাড়া শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডকেও তাঁরা মেনে নিতে পারছিলেন না বলে তিনি উল্লেখ করেন। কিন্তু খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে সে অভ্যুত্থান সেনাবাহিনীর ভেতরে আবারো চেইন অব কমাণ্ড ভাঙার সম্ভাবনা তৈরি করেছিল বলে মনে করেন জেনারেল চৌধুরী।

খালেদ মোশারফের অনুগত সৈন্যরা বন্দি করে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে। ঢাকা সেনানিবাসে যখন এ অবস্থা চলছিল সে সময় পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে জেলখানায় আওয়ামী লীগের চারজন সিনিয়র নেতাকে হত্যা করা হয়।

সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিল এক ধরনের বিশৃঙ্খলা। সিনিয়র সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। একদিকে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং অন্যদিকে মেজর জেনারেল খালেদ মোশারফ। তখন ঢাকা সেনানিবাসে মেজর পদমর্যাদায় কর্মরত ছিলেন বর্তমান ব্রিগেডিয়ার (অব) এম সাখাওয়াত হোসেন।

তিনি এসব ঘটনাপ্রবাহ বেশ কাছ থেকে দেখেছেন। তার সে অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি বই লিখেছেন 'বাংলাদেশ রক্তাক্ত অধ্যায় : ১৯৭৫-৮১' শিরোনামে। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'শেখ মুজিবকে হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তারা তখন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদকে পরিচালনা করছিলেন। বঙ্গভবনের থাকা সেনা কর্মকর্তাদের সাথে একটা সংঘাত চলছিল সেনানিবাসের উর্ধ্বতন কিছু সেনা কর্মকর্তাদের সাথে।

খন্দকার মোশতাক যে বেশিদিন ওখানে টিকবেন না, এটাও ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে একটা ধারণা জন্মেছিল। তখন আবার সিনিয়র অফিসারদের মধ্যেও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল। শেখ মুজিবকে হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তারা ধারণা করেছিলেন যে কোন পাল্টা অভ্যুত্থান হলে সেটি আওয়ামী লীগের সমর্থন পাবে। সে ধরনের পরিস্থিতি হলে কী করতে হবে সে বিষয়ে মুজিব হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তারা কিছুটা ভেবেও রেখেছিলেন।

ঐ ধরনের ক্যু হলে তখনকার আওয়ামী লীগে যাতে কোন ধরনের লিডারশিপ না থাকে সেটাই তারা বোধ হয় নিশ্চিত করেছিল'। হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তারা ভেবেছিল যদি জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয় তাহলে পাল্টা অভ্যুত্থান হলেও সেটি রাজনৈতিক সমর্থন পাবে না।

গত চার দশকে ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড বিষয়ে অনেক তথ্য-প্রমাণ ও দলিল বের হয়েছে। এ নিয়ে অনেকে বই লিখেছেন। পত্রপত্রিকায় এ সম্পর্কে শত শত লেখা বের হয়েছে। এ দুই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সম্পর্কে সে সময় সামরিক বাহিনীতে কর্মরত কর্নেল শাফায়াত জামিল, জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী, কর্নেল এম এ হামিদ ও ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেনসহ আরও অনেকে বই লিখেছেন। তাছাড়া ৩ নভেম্বর জাতীয় চার নেতা হত্যার সময় আইজি প্রিজন নূরুজ্জামান, ডিআইজি প্রিজন কে. আবদুল আউয়াল, জেলার আমিনুর রহমান, সুবেদার আবদুল ওয়াহেদ মৃধা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। তারা

চারজনই ছিলেন চার নেতা হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী। তাজউদ্দীন কন্যা সিমিন হোসেন রিমির গ্রন্থে এ সাক্ষাৎকারগুলো রয়েছে। এ চারজনের সাক্ষাৎকার এবং সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের লেখা গ্রন্থ থেকে দেখা যায়, অবৈধ রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ ও কর্নেল রশীদ ২ নভেম্বর মধ্যরাতের পর বঙ্গভবন থেকে ফোনে আইজি প্রিজনকে মুসলেমের নেতৃত্বে ৪ খুনিকে জেলে প্রবেশ করতে দিতে নির্দেশ দেন। অন্তত দুবার খুনি মোশতাক আইজি প্রিজনকে বলেন, সশস্ত্র মুসলেমরা যা করতে চায়, তাই যেন করতে দেয়া হয়। জেল গেটের খাতায় ওই চার খুনির নাম লেখা রয়েছে।

৪ নভেম্বর ডিআইজি প্রিজন কে. আবদুল আউয়াল লালবাগ থানায় মামলা করেন। এজাহারে ৪ খুনির নাম লেখা ছিল। এখনো জেল গেটের খাতায় এবং লালবাগ থানায় মোশতাক ও রশীদের নির্দেশে চার নেতাকে গুলি করেছে, বেয়নেট চার্জ করেছে– তাদের নাম লেখা রয়েছে। রাষ্ট্রপতির গদিতে অধিষ্ঠিত মোশতাকের নির্দেশেই মুক্তিযুদ্ধের মহান চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। জাতি শ্রদ্ধাভরে চার নেতাকে স্মরণ করছে। মোশতাকরা হারিয়ে গেছে ইতিহাসের অন্ধকারে।

মোশতাকের পর বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতি করা হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে সেনাপ্রধান, সশস্ত্র বাহিনী প্রধান, উপ-প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে সর্বময় ক্ষমতার মালিক বনে যান জেনারেল জিয়া। জেনারেল জিয়া শুধু বঙ্গবন্ধু ও জেলহত্যার বিচার বন্ধ রাখেননি, আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিদেশী মিশনে উচ্চপদে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃতও করেছিলেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম কলঙ্কিত অধ্যায় ৪ নভেম্বর জেলহত্যা দিবস। যতদিন বাঙালি জাতি বাংলাদেশ থাকবে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় চারনেতা ও তাঁদের অবদানকে। ইতিহাসের পাতায় অমলিন জাতীয় চারনেতা। বাঙালি জীবনে ঘৃণাভরে কলংঙ্কের সাথে উচ্চারিত হবে জেলহত্যাকারী, হত্যার নেপথ্য ষড়যন্ত্রকারীদের নাম ও ইতিহাস।♦

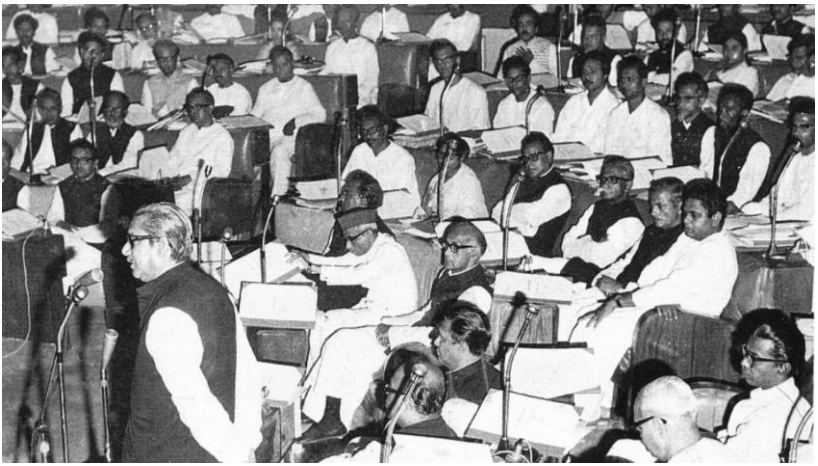

১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদে বক্তব্য রাখছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় সংবিধান ও আগামী প্রজন্মের কাছে প্রত্যাশা

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম

৪ নভেম্বর, ১৯৭২ গণপরিষদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান 'সংবিধান বিল' হিসেবে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। দিনটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সাংবিধানিক ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লাগাতার রক্তাক্ত সংগ্রাম করেছে। দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং নয় মাসের একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগ, মা-বোনদের সম্ভ্রম বিসর্জনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন একটি অনন্য ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ছিল।

২৩ মার্চ ১৯৭২ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক Constituent Assembly of Bangladesh Order, 1972 (P.O 22 of 1972) জারি করা হয়। রাষ্ট্রপতির ওই আদেশ বলে ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ গণপরিষদ'। বহিষ্কৃত ও পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য পোষণকারীরা গণপরিষদের

সদস্য পদ লাভে অযোগ্য ছিলেন। রাষ্ট্রপতির উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ ৭ অনুযায়ী গণপরিষদকে একটি সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১০ এপ্রিল, ১৯৭২। বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবে এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামের সমর্থনে শাহ আব্দুল হামিদ ও তাজউদ্দিন আহমদের প্রস্তাবে এবং ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলীর সমর্থনে জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ যথাক্রমে গণপরিষদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন।

পরদিন ১১ এপ্রিল গণপরিষদের অধিবেশনে ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে 'গণপরিষদের ৩৪ জন সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত খসড়া প্রণয়ন কমিটি-যার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ড. কামাল হোসেন'– প্রস্তাবটি উত্থাপন করলে তা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। মোট ৮৫ দিন কমিটির বৈঠক হয়। ১২ অক্টোবর ১৯৭২, কমিটির সভাপতি ড. কামাল হোসেন 'সংবিধান বিল' গণপরিষদে উত্থাপন করেন।

এ উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় না, দশ মাসের মধ্যে কোন দেশ শাসনতন্ত্র দিতে পেরেছে। আমি নিশ্চই মোবারকবাদ জানাব শাসনতন্ত্র কমিটির সদস্যদেরকে। মোবারকবাদ জানাব বাংলার জনসাধারণকে। রক্তে লেখা এই শাসনতন্ত্র। যারা আজ অন্য কথা বলেন বা চিন্তা করেন, তাদের বোঝা উচিত যে, এ শাসনতন্ত্র আলোচনা আজ থেকে শুরু হয় নাই। অনেকে যারা বক্তৃতা করেন, তাদের জন্মের আগের থেকে তা শুরু হয়েছে এবং এ জন্য অনেক আন্দোলন করতে হয়েছে। অনেক রক্ত দিতে হয়েছে। এই শাসনতন্ত্রের আলোচনা হতে হতে শাসনতন্ত্র কী হবে তার উপরে ভোটের মাধ্যমে শতকরা ৯৮ জন লোক তাদের ভোট আওয়ামী লীগকে দিয়েছেন। শাসনতন্ত্র দেওয়ার অধিকার আওয়ামী লীগের রয়েছে। .... শাসনতন্ত্র ছাড়া কোন দেশ– তার অর্থ হল মাঝিবিহীন নৌকা, হালবিহীন নৌকা। শাসনতন্ত্রে মানুষের অধিকার থাকবে, শাসনতন্ত্রে মানুষের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যও থাকবে। এখানে Free style democracy চলতে পারে না। শাসনতন্ত্রে জনগণের অধিকার থাকবে, কর্তব্যও থাকবে এবং যতদূর সম্ভব, যে শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়েছে, সেটা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে থাকবে, সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমাদের আদর্শ পরিষ্কার হয়ে রয়েছে। এই পরিষ্কার আদর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এবং সে আদর্শের ভিত্তিতে এদেশ চলবে। জাতীয়তাবাদ-বাঙালী জাতীয়তাবাদ-এই বাঙালী জাতীয়তাবাদ চলবে বাংলাদেশ। বাংলার কৃষ্টি, বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার আকাশ-বাতাস, বাঙালীর রক্ত দিয়ে বাংলার জাতীয়তাবাদ। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, জনসাধারণের

ভোটের অধিকার বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি সমাজতন্ত্রে, যেখানে শোষণহীন সমাজ থাকবে। শোষক-শ্রেণী আর কোনদিন দেশের মানুষকে শোষণ করতে পারবে না। .... আর হবে ধর্মনিরপেক্ষতা। .... এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে বাংলার শাসনতন্ত্র তৈরী হবে। এটা জনগণ চায়, জনগণ এটা বিশ্বাস করে। জনগণ এই জন্য সংগ্রাম করেছে। লক্ষ লক্ষ লোক এই জন্য জীবন দিয়েছে। এই আদর্শ নিয়েই বাংলার নতুন সমাজ গড়ে উঠবে।"

দৈনিক
ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ
৩০ লক্ষ শহীদের রক্তে লেখা সংবিধানে
বঙ্গবন্ধু সহ পরিষদ
সদস্যদের স্বাক্ষরদান
যাঁদের রক্তে মুক্ত জন্মভূমি,
স্মৃতি আজ শুধু তাহাদেরে যায় চুমি

সংবিধান বিল উত্থাপিত হওয়ার পর সর্বমোট ১৭টি অধিবেশনে বিভিন্ন সংশোধনী প্রস্তাবসহ বিলটির ওপর আলোচনার পর ৪ নভেম্বর ১৯৭২ গণপরিষদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

সংবিধান বিল গৃহীত হওয়ার পূর্বে আলোচনায় অংশ নিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "জনাব স্পীকার সাহেব, আজই প্রথম সাড়ে সাত কোটি বাঙালী তাদের শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে। বাংলার ইতিহাসে বোধহয় এই প্রথম যে বাঙালীরা তাদের নিজেদের শাসনতন্ত্র দিচ্ছে। বোধ হয় না-সত্যিই এই প্রথম যে, বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিরা জনগণের ভোটের মারফতে এসে তাঁদের দেশের জন্য শাসনতন্ত্র দিচ্ছেন। .... এই শাসনতন্ত্র শহীদের রক্ত দিয়ে লেখা। কোন দেশে কোন যুগে আজ পর্যন্ত এত বড় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে এত তাড়াতাড়ি শাসনতন্ত্র দিতে পারে নাই। .... তাই মানুষের মৌলিক অধিকার যাতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে, তারই জন্য আমাদের পার্টি এই শাসনতন্ত্র প্রদান করল। আশা করি, জনগণ এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবেন এবং করেছেন। .... এই শাসনতন্ত্রের জন্য কত সংগ্রাম হয়েছে এই দেশে। .... শাসনতন্ত্র এমন একটা জিনিস, যার মধ্যে একটা আদর্শ, নীতি থাকে। সেই শাসনতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে আইন করতে

হয়। .... এই মৌলিক আইন বিরোধী কোন আইন হতে পারবে না। .... এটা জনতার শাসনতন্ত্র। .... ভবিষ্যৎ বংশধররা যদি সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তাহলে আমার জীবন সার্থক হবে, শহীদের রক্তদান সার্থক হবে।"

সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত: বঙ্গবন্ধুসহ জনপ্রতিনিধিদের স্বাক্ষর দান

বাঙ্গালীর বহুদিনের আশা পূর্ণ হল

শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি জাতির শ্রদ্ধা নিবেদন

'আজ আমি ধন্য'

স্বপ্ন বাস্তবায়িত

হত্যা রহস্য

বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাব অনুযায়ী ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিষদের অধিবেশন মুলতবী করা হয় এবং ওই দিনটিকে ঠিক করা হয় সংবিধানে সদস্যদের স্বাক্ষর দানের জন্য। সংবিধান কবে থেকে কার্যকর হবে সে বিষয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "জনাব স্পীকার সাহেব, আজ এই পরিষদে শাসনতন্ত্র পাশ হয়ে যাবে। কবে হতে এই শাসনতন্ত্র বলবৎ হবে, তা আমাদের ঠিক করতে হবে। আমি মনে করি, সেইদিন, যেদিন জল্লাদবাহিনী রেসকোর্স-ময়দানে মুক্তিবাহিনী ও আমাদের বন্ধু-রাষ্ট্রের মিত্র বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, সেই তারিখ। সেই ঐতিহাসিক ১৬ই ডিসেম্বর তারিখ থেকে আমাদের শাসনতন্ত্র কার্যকর করা হবে। সেই দিনের কথা রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। স্পীকার সাহেব, সেই ইতিহাস আমরা রাখতে চাই।"

১৪ ও ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭২ সংবিধানে গণপরিষদ সদস্যদের স্বাক্ষর দান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ তারিখ স্পিকারের আমন্ত্রণে সংবিধানে সর্বপ্রথম স্বাক্ষর প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান– প্রথমে সংবিধানের বাংলা এবং পরে ইংরেজী পাঠে। তারপর অন্যান্য সদস্যরা সংবিধানে স্বাক্ষর করেন।

গণপরিষদের সিদ্ধান্ত ও অভিপ্রায় অনুযায়ী ১৫ ডিসেম্বর দিবাগত রাত বারোটায় গণপরিষদের বিলুপ্তি ঘটে এবং রাত বারোটার পর অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ সংবিধান কার্যকর হয়।

উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর সংবিধান তৈরিতে সময় লেগেছিল প্রায় আট বছর। ঐ সংবিধান তৈরির পরপরই অব্যাহত সামরিক শাসন

মূলত পাকিস্তান রাষ্ট্রকে একটি বর্বর রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল, যেখানে সাংবিধানিক এবং আইনের শাসন ছিল অনুপস্থিত।

আমাদের সংবিধান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি অনন্য রাজনৈতিক দলিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে রকমারি বল্লমের অজস্র খোঁচায়। চেষ্টা করা হয়েছে সংবিধান ও রাষ্ট্রের মূল চরিত্র পাল্টে দিয়ে পাকিস্তানি ভাবধারায় সাম্প্রদায়িক একটি রাষ্ট্রে পরিণত করার। সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও বিভিন্ন রায় প্রদানের মাধ্যমে সচেষ্ট থেকেছে এবং আছে সংবিধানের মূল চরিত্র ও কাঠামোকে রক্ষা করতে। বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও লালনকারী সরকার ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকায় ১৯৭২-এর সংবিধানে বহুলাংশে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

সংবিধান বিলের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বলেছিলেন "ভবিষ্যৎ বংশধররা যদি সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তাহলে আমার জীবন সার্থক হবে, শহীদের রক্তদান সার্থক হবে।" সময়ের বাস্তবতায় অসাম্প্রদায়িক-শোষণহীন বাংলাদেশ গড়া আজ সত্যিই একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাঁধে রয়েছে অসাম্প্রদায়িক শোষণহীন বাংলাদেশ গড়ার অপরিসীম দায়িত্ব। সে কারণে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত, লালন ও বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন সংবিধানের মর্ম উপলব্ধি, সঠিক চর্চা ও লালন। ইতিপূর্বে একটি লেখায় ৪ নভেম্বর দিনটিকে জাতীয় 'সংবিধান দিবস' পালনের প্রস্তাব রেখেছিলাম। বিভিন্ন মহল থেকেও এ দাবি উত্থাপন করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সংবিধান গৃহীত বা কার্যকর হওয়ার দিনটিকে 'সংবিধান দিবস (Constitution Day)' হিসেবে বিভিন্ন আঙ্গিকে পালন করে থাকে। কোনো কোনো দেশে 'সংবিধান দিবস'-এ সরকারি ছুটি পালিত হয়। রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক মহল 'সংবিধান দিবস' পালনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে পারেন।♦

লেখক : বিচারপতি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ এবং সাবেক চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১, বাংলাদেশ।

মাওলানা আযাদ রাজনীতিতে ধর্মীয় সম্প্রীতির অগ্রদূত

ড. মাহফুজ পারভেজ

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যতম আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে ধর্ম-গোত্র-সম্প্রদায়গত ঐক্যের প্রবক্তা তিনি। ১১ অক্টোবর তাঁর ১৩১তম জন্মবার্ষিকী। তাঁর মূল নাম মাওলানা সাইয়েদ আবুল কালাম গোলাম মুহিউদ্দিন আহমাদ বিন খায়রউদ্দিন আল হোসাইনি।

পবিত্র নগরী মক্কায় জন্মগ্রহণকারী আযাদের মাতা আরবীয়, পিতা মাওলানা খায়রউদ্দিন আফগান বংশোদ্ভূত বাঙালি মুসলমান, যিনি ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের বিরূপ পরিস্থিতিতে হিজরত করে ভারত ছেড়ে মক্কায় চলে যান এবং ১৮৯০ সালে আবার সপরিবার কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

আরবি মাতৃভাষা হওয়ায় এবং ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ ও দৃঢ় বিশ্বাসী পারিবারিক পটভূমির কারণে প্রচলিত ধারায় ইসলামী শিক্ষার চর্চা করা ছাড়া আজাদের অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। প্রাতিষ্ঠানিক আধুনিক শিক্ষা লাভ না করলেও ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন ও ব্যাপক পাঠ্যাভ্যাসের মাধ্যমে তিনি উর্দু, ফারসি, হিন্দি ও ইংরেজিতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর সময়ের অনেক যশস্বী

ব্যক্তিদের মতো তিনিও নিজের চেষ্টায় শিক্ষিত হওয়ার পথ অনুসরণ করেন এবং বিশ্ব ইতিহাস ও রাজনীতি সম্পর্কে বিপুল জ্ঞানের অধিকারী হন।

পবিত্র কুরআন, হাদিস, ফিকহ্ ও কালামের নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করে তিনি অনেক লেখা প্রকাশ করেন। তাঁর পান্ডিত্যই 'তাকলিক' (সাদৃশ্যের ঐতিহ্য) পরিহার এবং 'তাজদিদ' (নতুন প্রথা প্রবর্তন) গ্রহণের পথে তাঁকে পরিচালিত করে।

তাজদিদ সম্পর্কে তাঁর ধারণা তাঁকে এ বিশ্বাসের দিকে চালিত করে যে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে ভারতের সকল ধর্ম ও গোত্রের জনগণ তাদের ধর্মবিশ্বাস ও কৃষ্টির সুসমন্বয় ঘটাতে পারে এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তা একমাত্র তখনই সম্ভব যখন সে রাষ্ট্র গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বাধীন রাষ্ট্র ভারতের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা ভিত্তিক গণতন্ত্রের ধারণাকে ভারতের যেসব রাজনৈতিক চিন্তাবিদ সর্বাগ্রে সংজ্ঞায়িত ও ব্যাখ্যা করেছেন আযাদ সম্ভবত তাঁদের অন্যতম। ধর্মীয় উদারতার মাধ্যমে রাজনৈতিক হিংসা প্রশমনে তিনি ছিলেন অগ্রণী ব্যক্তিত্ব।

যে পারিবারিক পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেছেন এবং যে ধরনের শিক্ষা লাভ করেছেন, তাতে তাঁর ধর্মীয় নেতা হওয়ারই কথা। তাঁর পূর্বপুরুষদের অধিকাংশই ধর্মবেত্তা ছিলেন বলে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা হননি তিনি। তবে রাজনীতির প্রতি আযাদের ঝোঁক ছিল। খুব অল্প বয়সেই তিনি রাজনীতির ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত জামালউদ্দীন আফগানির প্যান ইসলামী মতবাদ ও স্যার সৈয়দ আহমদ খানের আলীগড় চিন্তাধারার প্রতি তিনি বিশেষভাবে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। প্যান ইসলামী চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি আফগানিস্তান, ইরাক, মিশর, সিরিয়া ও তুরস্ক সফর করেন। তারপর জীবন ও রাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন এক উপলব্ধি নিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন।

ইরানে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত নির্বাসিত বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি ইরাকে সাক্ষাৎ করেন। তিনি মিশরে শেখ মুহম্মদ আব্দুহ্ ও সাঈদ পাশা এবং আরব বিশ্বের অন্যান্য বিপ্লবী কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন। কনস্টান্টিনোপলের তরুণ তুর্কিদের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক জ্ঞান ছিল। এসব গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ ও সংস্পর্শ তাঁকে ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে একজন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীতে পরিণত করে। ধর্ম ও জীবনের সংকীর্ণ ধারণার শৃঙ্খলমুক্তির স্মারকস্বরূপ তিনি লেখক হিসেবে 'আযাদ' নাম গ্রহণ করেন, যার অর্থ স্বাধীন।

বিদেশ থেকে ফিরে এসে আযাদ পূর্ব ভারতের দুজন নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী শ্রী অরবিন্দ ঘোষ ও শ্রী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ব্রিটিশ শাসন বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। প্রকৃতপক্ষে একদিকে তিনি ছিলেন একজন গোপন বিপ্লবী এবং অন্য দিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রকাশ্য কর্মী। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হবে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, আর সে ঐক্যের ভিত্তিমূল হবে রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ ধারণা। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে তিনি তুরস্কের খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেন, পুরানো শাসকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে নয় বরং নবীন তুর্কিদের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য। তাঁর মতে, 'নবীন তুর্কিরাাই ছিলেন খিলাফতের মূল বিধানের সত্যিকার প্রতিনিধি।'

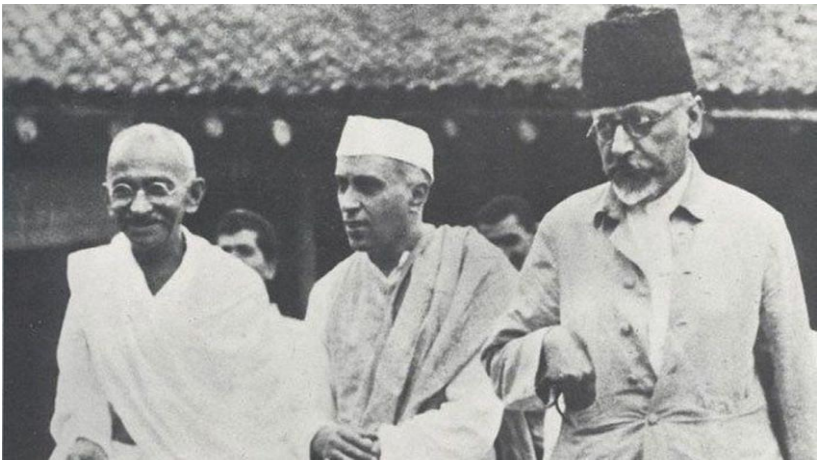

ভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম তিন নেতা মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু ও মওলানা আযাদ

১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত আযাদের উর্দু সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'আল-হেলাল' প্রকাশ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতে এর অপকর্মের আক্রমণাত্মক সমালোচনা করে। এ পত্রিকা কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী মতামত প্রকাশে একটি শক্তিশালী বিপ্লবী মুখপত্রে পরিণত হয়। সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্ট শত্রুতার পর হিন্দু-মুসলমান ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে 'আল-হেলাল' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্রিটিশ সরকার আল-হেলাল সাপ্তাহিকীকে বিপজ্জনক মতামত প্রচারে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং সে কারণে ১৯১৪ সালে পত্রিকাটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। আযাদ তখন এটির নাম পরিবর্তন করেন এবং 'আল-বালাগ' নামে অপর একটি সাপ্তাহিকী প্রকাশ করেন। এ পত্রিকারও উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভিত্তিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও বিপ্লবী ধ্যান-

ধারণা প্রচার করা। কিন্তু ১৯১৬ সালে সরকার এ পত্রিকাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং আযাদকে কলকাতা থেকে বহিষ্কার করে করাঁচিতে অন্তরীণ করে রাখে। সেখান থেকে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে মুক্তি পান।

মওলানা আবুল কালাম আযাদ ততদিনে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসে মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু এবং সি. আর. দাসের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অন্যতম সদস্য এবং গান্ধীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ঘনিষ্ঠ সহচরদের একজন হিসেবে স্বীকৃত। তিনি দিল্লি (১৯২৩) ও রামগড়ে (১৯৪০) কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে ভারতীয় রাজনীতির উত্তাল দিনগুলোতে আযাদ মহাত্মা গান্ধীর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ উপদেষ্টা হিসেবে আবির্ভূত হন। ক্রিপস মিশন (১৯৪২) থেকে শুরু করে কেবিনেট মিশন (১৯৪৬) পর্যন্ত সকল আলোচনায়, বিশেষত ভারতের সাংবিধানিক বিষয়ে ও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে, আযাদের সঙ্গে গান্ধী ঘনিষ্ঠভাবে পরামর্শ করেছেন। ক্রিপস মিশন (১৯৪২) এবং কেবিনেট মিশন (১৯৪৬) এ উভয় সময়েই সমঝোতা-পূর্ব আলোচনা বৈঠকে আলোচকদের মধ্যে আযাদ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলন শক্তিশালী হওয়ায় এবং হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটার ফলে আযাদের প্রভাব হ্রাস পায়। তাঁর লেখা চিঠিপত্র এবং আত্মজীবনীতে তিনি এ প্রসঙ্গে তাঁর হতাশার কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, 'ভারতের বিভক্তি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হতো যদি কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আপসমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর (আযাদের) মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতেন।'

আযাদ নেহরুর অভিপ্রায়ের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে, নেহরুর মনোভাব কেবিনেট মিশন পরিকল্পনাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতকে বিভক্তির দিকে চালিত করে। কিন্তু শেষের দিকে সৃষ্ট রাজনৈতিক মতপার্থক্য দুই নেতার বন্ধুত্বকে ম্লান করতে পারেনি। তিনি তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনীগ্রন্থ 'ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম' নেহরুর নামে উৎসর্গ করে তাঁর সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তিনি। সর্বজনীন শিক্ষা এবং মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় জীবনভর কাজ করেছেন তিনি।♦

লেখক : প্রফেসর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১১ নভেম্বর জন্মদিনে মাওলানা আযাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

শিক্ষিত জাতি গঠনে মাওলানা আযাদের অবদান

ড. এ. সালাম

(সারসংক্ষেপ : মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) উপমহাদেশের একজন স্বনামধন্য সাংবাদিক, রাজনীতিক ও শিক্ষাবিদ ছিলেন। সাংবাদিকতার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামে শামিল হন। দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে ইংরেজ শাসকদের হাত থেকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব যখন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের হাতে সমর্পিত হয় তখন মাওলানা আযাদ-কে স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রীসভায়

শিক্ষামন্ত্রীর জন্য নির্বাচিত করা হয়। ভবিষ্যতের উন্নত ও টেকসই ভারত বিনির্মাণে শিক্ষামন্ত্রীর পদটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর সেটা অনুধাবন করেই মাওলানা আযাদ শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি ও বিস্তৃতির লক্ষ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সার্বজনীন শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করণ, নারীশিক্ষার উন্নতি এবং বিশেষত ভারতে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল শিক্ষার বিস্তারে সময়োচিত পদক্ষেপ ও উচ্চশিক্ষার প্রসারে মাওলানা আযাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপ্রচেষ্টা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে সমাদৃত হয়। বক্ষমাণ প্রবন্ধে মাওলানা আযাদের কর্মপ্রচেষ্টা ও শিক্ষাভাবনা সবিস্তারে তুলে ধরা হলো।)

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) একাধারে একজন আলেম, মুজতাহিদ, সমাজচিন্তক, রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ ছিলেন। দিল্লির সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব শায়েখ জামালুদ্দিন ওরফে শায়েখ বাহালুল দেহলবীর বংশে জন্মগ্রহণ করার কারণে আযাদ জন্মগতভাবেই অসাধারণ মেধা ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। ওহীভিত্তিক জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্ম ও বেড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিলেন। ফলে আযাদ ঐশী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বাহক হয়েছিলেন সেই বাল্যকালেই।

তাছাড়া আযাদের পড়ালেখা সম্পন্ন হয় তার পিতা বিখ্যাত সূফী মাওলানা খায়রুদ্দিনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে। পাশাপাশি আযাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পারিবারিক পরিবেশ সূফীতত্ত্ব চর্চায় ভরপুর ছিল। এগার বছর বয়সে মাওলানা আযাদ সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। প্রথম জীবনে কাব্যচর্চা করলেও খুব তাড়াতাড়ি আযাদ গদ্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। সাংবাদিকতার প্রতি আযাদের সীমাহীন ঝোঁক ছিল। ১৮৯৯ সালে কলকাতা থেকে 'নয়ারঙ্গে আলম' নামক একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। তবে ১৯০৩ সালে কলকাতা থেকে নিজ সম্পাদনায় মাসিক 'লিসানুস সিদ্‌ক' নামক পত্রিকা প্রকাশের পর পাঠক ও বুদ্ধিজীবী মহলে আযাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে আযাদের ডাক পড়ে। এভাবে এক পর্যায়ে আল্লামা শিবলী নু'মানী, মৌলবী জাকাউল্লাহ ও আলতাফ হোসাইন হালী-এর ন্যায় বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে আযাদের পরিচয় ও সখ্য গড়ে ওঠে। তাঁদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে আযাদ মানসে চিন্তার প্রসার ঘটে। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দৃষ্টি বিস্তৃতি লাভ করে।

মাওলানা আযাদ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রাজনীতির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে ১৯০৫ সালে উপমহাদেশের উপর আপতিত বঙ্গভঙ্গের ঘটনা মাওলানা-কে ব্যথিত ও তাড়িত করে। বৃটিশ সরকারের 'ভাগ করো-আর শাসন করো' এই অন্যায় নীতি মাওলানা-কে অশান্ত ও বিদ্রোহী করে তোলে। স্বদেশবাসীর মুক্তির অন্বেষায় মাওলানা আযাদ তৎকালীন বাংলার বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী ও অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের সঙ্গে সাক্ষাত করে হৃদ্যতা তৈরি করেন। প্রথম দিকে হিন্দু বিপ্লবীগণ একজন মুসলিম মাওলানা-কে তাদের দলভুক্ত করতে ইতস্তত করলেও অচিরেই তাদের বিশ্বাস জন্মে যে, প্রকৃত মুসলমানও ব্রিটিশ বিরোধী হতে পারে।

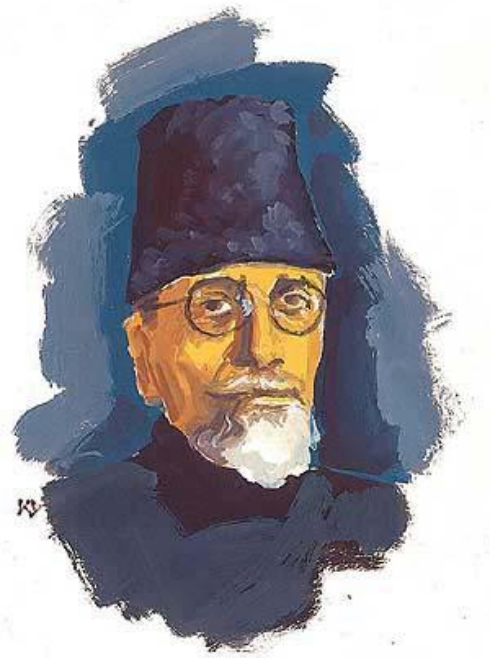

১৯০৮ সালে আযাদের পিতা মাওলানা খায়রুদ্দিন ইন্তেকাল করেন। পিতৃ হারানোর শোক ও দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক দূরাবস্থা মাওলানা আযাদ-কে অস্থির করে তোলে। স্বদেশবাসীর কাঁধে দাসত্বের শৃঙ্খল এবং ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচার-নির্যাতন অসহ্য হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় মাতৃভূমি ও দেশবাসীকে এহেন অত্যাচার থেকে মুক্তি দিতে বদ্ধপরিকর হন। পিতার অর্পিত দায়িত্ব; পীর-মুরিদী ছেড়ে স্বদেশবাসীর মুক্তি আন্দোলনের প্রতি বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

দেশবাসীর কানে স্বাধীনতার বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য সাংবাদিকতাকে মাওলানা আযাদ মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। দেশব্যাপী ভ্রমণ করে সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেন।

স্বদেশী রাজনীতিকগণ এভাবে দীর্ঘদিন মিলেমিশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট হিন্দুস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন ভারতের অভ্যুদয় ঘটে।

উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসে মাওলানা আযাদ প্রজ্ঞা, রাজনীতি ও কূটনীতিতে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন; সে কারণে স্বাধীন ভারতের জাতির জনক মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী ওরফে মহাত্মা গান্ধী এবং ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহার লাল নেহেরুসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ-কে স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী নির্বাচিত করেন।[১]

মাওলানা আযাদ ছিলেন অখণ্ড ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা। সে কারণে ভারতভাগ মাওলানা-কে চরমভাবে ব্যথিত করে; তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হয়। এমনকি জিন্নাহ'র যে দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিরুদ্ধে জীবনভর মাওলানা আযাদ সরব ছিলেন, তাকেই এক পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়। মাওলানা এ সবের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি। মনোপীড়ায় ভুগছিলেন। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্তির পর নবীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী, টেকসই ও উন্নয়নমুখী করতে পেছনের সকল গ্লানি, অপ্রাপ্তি ও দুঃখ ভুলে জাতীয় গুরুদায়িত্ব পালনে মনোযোগী হন। স্বাধীন ভারতের শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন আযাদের জাতিসেবার অন্যতম অধ্যায়।[২]

মাওলানা আযাদ ছিলেন মানবতার সেবক। সৃষ্টির সেবা ছিল তার জীবনের ব্রত। স্বদেশবাসীর উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য মাওলানা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করে সাধারণ মানুষকে এটা বুঝাতেন যে, কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতি দরকার। তবে তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন; শিক্ষার প্রসার। কেননা শিক্ষা একটি জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষিত জাতি-ই কেবল পারে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে। শিক্ষার বিকল্প হতে পারে শুধুই শিক্ষা।

১৯৪৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ভারতে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার/সংবিধান প্রণয়ন সংসদে মাওলানা আযাদ যোগদান করেন। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে উচ্চতর শিক্ষা পর্যন্ত যেখানে যতটুকু দুর্বলতা ছিল, শিক্ষা মন্ত্রীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে মাওলানা আযাদ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। এই দুর্বলতাসমূহ দূর করা ও নবীন ভারতের জাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি রক্ষা করে

একটি উন্নত ও টেকসই শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে মাওলানা আযাদ অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। শিক্ষামন্ত্রী মাওলানা আযাদ প্রত্যেক নাগরিকের জন্য শিক্ষাকে জরুরি মনে করতেন। তাঁর মতে-শিক্ষিত ব্যক্তি নাগরিক হিসেবে সভ্য হয়। ১৯৪৮ সনের ১৬ই জানুয়ারি নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনে মাওলানা আযাদ বলেন,

> We must not a moment forget, it is a birth right of every individual to receive at least basic education without which he cannot fully discharge his duties as citizen.[3]
>
> অর্থ : এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের এটা ভুললে চলবেনা যে, প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পাওয়া প্রতিটি নাগরিকের জন্মগত অধিকার এবং প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক সুনাগরিকের দায়িত্ব।

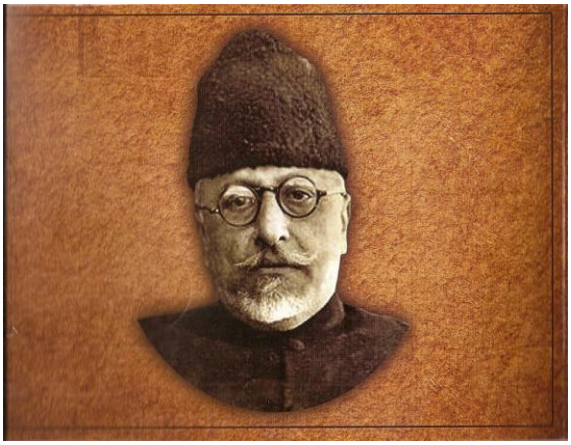

মাওলানা আযাদ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও তা বাধ্যতামূলক করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য সদ্য স্বাধীন ভারতে এটি কিছুটা কঠিন কাজ ছিল। কেননা প্রথমত এ বিষয়ে ভারতে তখন পর্যন্ত কোন আইন বলবৎ ছিলনা। দ্বিতীয়ত সদ্য স্বাধীন দেশে আর্থিক সংকটও ছিল। তবে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন প্রণয়নের চেয়েও অর্থের যোগানকে মাওলানা অগ্রাধিকার দেন। কেননা শিক্ষার জন্য অর্থের যোগান দিতে না পারলে তার জন্য আইন তৈরী করা অনর্থক।

যেমন, ১৯১০ সালের ১৮ই মার্চ ভারতীয় নেতা গোপাল কৃষ্ণ গোখলে "অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিল" নামে একটি বিল তৎকালীন

ইমপেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে উপস্থাপন করেছিলেন কিন্তু তা কাউন্সিলেই বাতিল হয়ে যায়। আবার ১৯১৭ সালে বিট্টল ভাই প্যাটেলও অনুরূপ একটি বিল কাউন্সিলে পাশ করাতে সক্ষম হন বটে; কিন্তু অর্থসংস্থান এবং সরকারের সদিচ্ছার অভাবে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।[৪]

এমনকি ১৯৩০ সালে ব্রিটিশ সরকার এরকম একটি আইন পাশ করে যে, "প্রত্যেক শিশুকে অবশ্যই শিক্ষা অর্জন করতে হবে। নইলে তার পরিবার থেকে জরিমানা আদায় করা হবে।" কিন্তু এ আইনও কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

কেননা, আর্থিক সঙ্গতি ও শিক্ষা ব্যয়ের সংকুলান করা ছাড়া কেউ নিজ সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে চাইলেন না। অন্যায্য আইন ও আর্থিক প্রশ্নের টানাপোড়েনের এক পর্যায়ে ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদি তদারকির জন্য ১৯২৯ সালে গঠিত স্যার পি. জে. হার্টগ কমিটি উক্ত আইনটাই বিলুপ্ত করে দেন।[৫]

শিক্ষামন্ত্রী মাওলানা আযাদ শিক্ষা বিষয়ক পেছনের দীর্ঘ ইতিহাস জানতেন। তাই শিক্ষা উন্নয়ন ও বাধ্যতামূলক করণে তিনি প্রথমেই স্বাধীনতা পরবর্তী পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হওয়ার বদলে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ এবং শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে বুঝাতে মনোযোগী হন। মাওলানা আযাদ শিক্ষাব্যয়কে বিনিয়োগ ধরে উক্ত খাতের বাজেটে বেশি অর্থ বরাদ্দের চেষ্টা করেন। মাওলানা আযাদ সংসদে এক বক্তৃতায় বলেন,

> "ব্রিটিশ সরকার তার জাতীয় বাজেটের সাত শতাংশ শুধু শিক্ষাখাতে ব্যয় করে। অথচ আমরা শিক্ষায় ব্যয় করি জাতীয় বাজেটের মাত্র এক শতাংশ, এটা পরিমাণে খুবই কম। নবীন ভারতের বিনির্মাণে শিক্ষাখাতে দিন দিন আমাদের ব্যয় বাড়াতে হবে। উন্নত দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল শিক্ষার বিস্তার খুবই জরুরি। আর এর জন্য দরকার অর্থের যোগান।"[৬]

মাওলানা আযাদের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় বাজেটে যদি শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান হয়ে যায় তাহলে শুধু প্রাথমিক শিক্ষা-ই নয় বরং দেশে সকল প্রকার শিক্ষার বিস্তার সহজ হবে। শিক্ষা বিস্তারের এই মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মাওলানা আযাদ তদানীন্তন ভারতের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও অন্যতম সংবিধান প্রণেতা বাবা সাহেব আম্বেদকার এর মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানে এই নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করিয়ে নেন যে, "এগার বছর বয়স পূর্তির পূর্বে কোন শিশু কর্মে/

চাকুরিতে যুক্ত হতে পারবে না।" অর্থাৎ প্রতিটি শিশু এই সময়ে শিক্ষা অর্জনে নিয়োজিত থাকবে।

যেমন: ভারতের সংবিধানের ২৩নং ধারায় বিধিবদ্ধ আইন হলো- Every citizen is entitled of right to free primary education and it shall be the duty of the state to provide it.

বি.জি. খের কমিটি কর্তৃক পূর্বে স্থিরিকৃত কেন্দ্রের এই সাংবিধানিক আইনকেই শুদ্ধ করে ১৯৪৭ সালে ভারতীয় সংবিধান উপদেষ্টা পরিষদ স্থির করলেন যে, state shall endeavour to provide. অর্থাৎ প্রাদেশিক সরকার তা বাস্তবায়ন করবে।[৭]

এভাবে মাওলানা আযাদ শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করে শিক্ষার জন্য এক দীর্ঘমেয়াদী ও মজবুত পলিসি তৈরীর জন্য অক্লান্ত চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। মাওলানা আযাদের শিক্ষা ভাবনা চারটি ভিত্তির উপর স্থিরিকৃত।

(১) মেধার স্ফুরণ, (২) ঐক্য ও প্রগতি, (৩) ধর্মীয় সম্প্রীতি, এবং (৪) বিশ্বভ্রাতৃত্ব। মাওলানার মতে- স্বাধীন ভারতে শিক্ষার সব থেকে বড় উদ্দেশ্য হলো: নতুন প্রজন্মের মাঝে জাগরণ সৃষ্টি করা। কেননা, পূর্বে ইংরেজদের তৈরি শিক্ষা ব্যবস্থা নব প্রজন্মের মাঝে দুটি ক্ষতিকর দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছে। প্রথমত পরাধীনতার মনোভাব, দ্বিতীয়ত ভাই-ভাইয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদ। ইংরেজদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল- সরকারের পক্ষে এমন এক শ্রেণি আমলা সৃষ্টি করা; যারা মন-মগজে ইংরেজদের অনুসারী হবে। এ উদ্দেশ্যেই তারা এদেশে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে। আর শিক্ষাকে বানায় উক্ত কার্যসিদ্ধির মোক্ষম হাতিয়ার। এ কারণেই মাওলানা আযাদ জাতির চেতনা থেকে ইংরেজদের এই বিষ-বাস্প মুছে ফেলার আহবান জানান। অতঃপর ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য পূর্তিতে দাসত্বের বদলে স্বাধীনতার চেতনা ও সংকীর্ণ চিন্তার বদলে ধর্মীয় উদারতার শিক্ষা নিতে ডাক দেন। ফলে বর্তমানে আমরা পশ্চিমা ধাঁচের চিন্তা-চেতনা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের সোনালী অতীত স্মরণ ও তা বরণ করতে পারছি। মাওলানা আযাদ শিক্ষাকে শুধু চাকুরি জোগার করার মাধ্যম না বানিয়ে বরং চিন্তার প্রসারতা ও ভবিষ্যতে ব্যক্তির মধ্যে 'খুদী' (ব্যক্তিত্ব) তৈরির মাধ্যম বানানোর উপর জোর দেন।

প্রায় দু'শো বছর যাবত পশ্চিমা শিক্ষা নতুন প্রজন্মকে যেভাবে দাসত্বের মনোভাবে আটকে ফেলেছিল, সমাজে সংকীর্ণ চিন্তার বিস্তার ঘটিয়ে দেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত করে তুলেছিল; সে অবস্থার দ্রুত উত্তরণ অবশ্যম্ভাবী ছিল।

মাওলানা আযাদ ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। অপরদিকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও অবৈতনিক সার্বজনীন শিক্ষা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে রাজ্য সরকারের উপর অর্পিত ছিল। রাজ্য সরকারের কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ অনাহুত বটে। ফলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষার কর্মসূচি বাস্তবায়নে মাওলানার ভূমিকা গৌণ ছিল। তদুপরি মাওলানা আযাদ শিক্ষার মত মহান ব্রত অগ্রসরমাণ করার লক্ষ্যে উক্ত কাজে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন।

শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ জরুরি বিধায় মাওলানা সেদিকে মনোযোগ দেন। কয়েক বছরের মধ্যে শিক্ষায় বাজেট বৃদ্ধি পেয়ে কয়েকগুণ হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মিত হয়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি পায়। আজকের শিশু আগামী দিনের কর্ণধার। শিশুশিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষার যাবতীয় বন্দোবস্ত মাওলানার হাত ধরে যাত্রা শুরু করে।[৮]

মাওলানা আযাদ সার্বজনীন শিক্ষাকে এত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন যে, তিনি বার বার বলতেন-'তোমরা নারীদেরকে শিক্ষিত করে তোল।' ১৯৪৯ সালে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন,

> "সার্বজনীন শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তোমরা প্রথমত নারীদেরকে শিক্ষা-দীক্ষায় উপযুক্ত করে তোল। এতে দু'রকম লাভ হবে। প্রথমত সে নিজে শিক্ষিত হবে। দ্বিতীয়ত উক্ত নারী যখন মা হবে তখন সে নিজ সন্তানকে শিক্ষিত করে তুলবে। কেননা, কোন শিক্ষিত মা তার সন্তানকে শিক্ষার আলো বঞ্চিত করবেন না।"[৯]

ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষাকে যেন নাগরিকের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয় এজন্য মাওলানা আযাদ আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় স্বপ্ন পূরণ না হলেও মাওলানার লালিত সেই স্বপ্ন অবশেষে ২০১০ সালে পূরণ হয়েছে। ২০১০ সালের ১লা এপ্রিল ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভায় সংবিধান সংশোধন করে শিক্ষাকে নাগরিকের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে আইন পাশ হয়।[১০]

সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষার প্রসারে মাওলানা আযাদ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। রেডিও, টেলিভিশন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং লোকালয়ে ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে জনগণের মাঝে শিক্ষার গুরুত্ব প্রচার করেন।

ব্রিটিশ প্রভাবমুক্ত সদ্য স্বাধীন ও অগ্রসরমাণ ভারতে উন্নয়ন-অগ্রগতির সোপান শিক্ষাকে গণমুখী ও কার্যকর করতে মাওলানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিশেষত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও নারী শিক্ষার বিস্তারে অবদানের জন্য মাওলানা আযাদ-কে শিক্ষা উদ্যোক্তা বলা হয়। এমনকি প্রতিবছর মাওলানা আযাদের জন্মদিন '১১ই নভেম্বর' ভারতের জাতীয় শিক্ষা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ভারত সরকার ১৯৯২ সালে মাওলানা আযাদ-কে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক খেতাব 'ভারত রত্ন' পদকে ভূষিত করে। মাওলানার প্রতি সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে ১৯৫৬-৫৭ সেশন থেকে ভারতের জাতীয় খেলাধুলা পদক 'মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ট্রফি বা MAKA TROPHY নামে নামকরণ করা হয়েছে।

দার্শনিক শিক্ষামন্ত্রী মাওলানা আযাদ শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তাঁর মতে, গণতন্ত্র ও উন্নয়নের জন্য শিক্ষা অতীব জরুরি বিষয়। এমনকি শিক্ষা জীবনের অঙ্গ। যুগোপযোগী ও টেকসই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য মাওলানা আযাদ ১৯৪৮ সালে বালা সাহেব গঙ্গাধর খের ওরফে বি. জি. খের কমিটি গঠন করেন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে মাওলানা আযাদের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর উক্ত সম্মেলন ড. তারা চাঁদ এর নেতৃত্বে একটি কমিটি করে। যাতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার জন্য পূর্বে গঠিত কমিটিগুলোর রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। উন্নত ও টেকসই ভারত বিনির্মাণে মাওলানা আযাদ বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করেন। ১৯৫১ সালে ভারতের খরগপুরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী-আইআইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এর উপর ভিত্তি করে ভারতের বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা এত সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

১৯৪৭ সালে বিজ্ঞানী শান্তি স্বরূপ ভাটনগর এর সভাপতিত্বে সায়েন্টিফিক ম্যানপাওয়ার কমিটি গঠন করে দেশে প্রকৌশল খাতে প্রয়োজনীয় জনশক্তির প্লান করে উক্ত খাতে উন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে মাওলানা আযাদ ১৯৫১ সালে প্রাইমারী এডুকেশন কমিটি, ১৯৫২ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। উচ্চতর শিক্ষার বিস্তার ও ব্যবস্থাপনার জন্য তিনি ১৯৫৩ সালে নয়াদিল্লিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠন করেন। সাহিত্য, নৃত্যকলা ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ১৯৫৩ সালে পৃথক তিনটি একাডেমী গঠন করেন। এছাড়াও মাওলানা আযাদের কীর্তিবাহী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্স (আইসিসিআর), কাউন্সিল ফর সাইন্টিফিক ও হিস্টোরিকাল রিসার্চ, দি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সাইন্স,

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর সোশ্যাল সাইন্স রিসার্চ, দি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বেসিক এডুকেশন, সেন্ট্রাল ব্যুরো অব টেক্সট বুক রিসার্চ, দি ন্যাশনাল বোর্ড অব অডিও এন্ড ভিজ্যুয়াল এডুকেশন, দি হিন্দু শিক্ষা সমিতি এবং দি বোর্ড অব সাইন্টিফিক টেকনোলজী ফর হিন্দী।

একজন প্রতিভাবান শিক্ষামন্ত্রী ও জাতির সেবক হিসেবে মাওলানা আযাদ সবসময় শিক্ষাকে সার্বজনীন এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করতে সচেষ্ট ছিলেন। বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার উপর ভিত্তি করে সার্বভৌম, শক্তিশালী এবং টেকসই ভারত বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর স্বপ্ন অনেকাংশে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। অন্তত এটা তো অবশ্যই হয়েছে যে, ভারত আজ তার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের মধ্যে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষায় চীন-জাপানের পরে সবচেয়ে বেশী অগ্রসরমাণ। আর এর ভিত রচনা করেছিলেন মাওলানা আযাদ। বর্ণিত অবদানের কারণে মাওলানা আযাদ-কে নিঃসন্দেহে একজন সফল ও দূরদর্শী শিক্ষামন্ত্রী বলা যায়। ১৯৮৮ সালের ১১ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করা এই মহান কর্মবীর ১৯৫৮ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে ইন্তেকাল করেছেন। আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁকে স্বরণ করছি।♦

তথ্যসূত্র :

১) সম্পাদনা পরিষদ, *ইওয়ানে উর্দু কা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ নম্বর* (দিল্লি: উর্দু একাডেমি, ২০১৪), পৃ. ৮৯-৯০
২) পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫
৩) স্বপন মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বপথিক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০১৫), পৃ. ১৭৫
৪) পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫
৫) পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫
৬) পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২
৭) পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬
৮) পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬
৯) পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫
১০) পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪

লেখক : চেয়ারম্যান, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ফাউন্ডেশন
E-mail: nsalam919@gmail.com

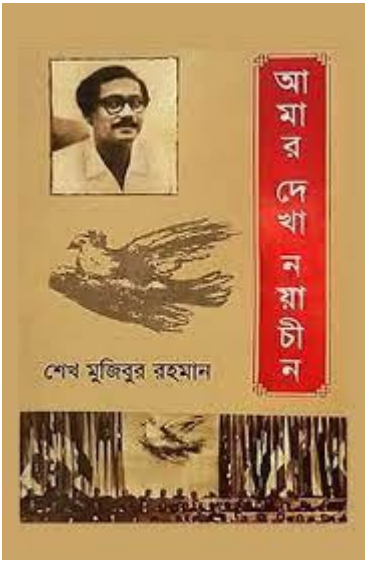

বঙ্গবন্ধুর আমার দেখা নয়াচীনে ধর্মীয় চিন্তাধারা

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
মো. আশরাফুল ইসলাম

ভূমিকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী ও অতুলনীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। শৈশব থেকেই বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে ইসলাম ও ইসলামী আদর্শ যথাযথভাবে বিদ্যমান ছিল। বাল্যকাল থেকেই সম্পূর্ণ ধর্মীয় পরিবেশে প্রতিপালিত হওয়ার কারণে ইসলামের প্রতি তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন। ফলশ্রুতিতে তাঁর সার্বিক কর্মকাণ্ডের প্রতিটি বিষয়ে ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন ঘটে। বহু সংখ্যক মানবিক গুণাবলি নিয়েই বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির কাণ্ডারি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে বরেণ্য রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন ভালো মানের লেখক, যা তাঁর বিভিন্ন রচনাবলি থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি ছিলেন একজন সময় সচেতন রাজনীতিবিদ। তাই তো পাকিস্তানের জালিম শাসকের রোষানলে পড়ে কারাগারে আবদ্ধ থাকাকালীন সময়গুলো অযথা নষ্ট করেননি। এ সময়গুলো তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন গ্রন্থ রচনায় অতিবাহিত করেন। পরবর্তী সময়ে যেগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থটি ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কেননা এতে ভ্রমণেতিহাস, রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর ধর্মীয় চিন্তাধারা সম্পর্কেও সুন্দর আলোচনা চিত্রিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে অত্র গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানের পর এ গ্রন্থের আলোকে বঙ্গবন্ধুর ধর্মীয় চিন্তাধারা সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

আমার দেখা নয়াচীন গ্রন্থ পরিচিতি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত তৃতীয় গ্রন্থ সংকলন 'আমার দেখা নয়াচীন'। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ থেকে বাংলাকে মাতৃভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার দাবিতে যে আন্দোলন তিনি করেছিলেন সেই আন্দোলনের পর থেকে বহুবার তাঁকে কারাগারে অন্তরীণ হতে হয়। মাতৃভাষার মর্যাদা দান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার আদায়, ক্ষুধার্ত মানুষের অন্নের দাবি, কৃষক-শ্রমিকদের দাবিসহ বিভিন্ন ন্যায্য বিষয়ে তিনি আন্দোলন করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৯ সালে তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন। পরবর্তীতে ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তিনি মুক্তি পান।

১৯৫২ সালের ২-১২ অক্টোবর গণচীনের পিকিংয়ে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে পিস কনফারেন্স অব দি এশিয়ান এ্যান্ড প্যাসিফিক রিজিওন্স নামক একটি আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শান্তি সম্মেলনে ভারত ও পাকিস্তানের ডেলিগেটরাও অংশ নেন। এরই

ধারাবাহিকতায় এ সম্মেলনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশ থেকেও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নেতা চীন সফর করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য হিসেবে এ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে নয়াচীন সফর করেন। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তান থেকে আতাউর রহমান, মানিক মিয়া, খন্দকার মো. ইলিয়াসসহ আরও বেশ কয়েকজন অংশগ্রহণ করেন। এটি বঙ্গবন্ধুর প্রথম চীন সফর। এই সফরে চীনের অবিসংবাদিত নেতা মাও সে তুং-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এছাড়াও ১৯৫৭ সালে শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ-এইড দফতরের মন্ত্রী থাকাকালে চীন সরকারের আমন্ত্রণে পাকিস্তান সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে তিনি দ্বিতীয়বার চীন ভ্রমণ করেন। তবে সে ভ্রমণের কোন লেখা পাওয়া যায়নি।

'আমার দেখা নয়াচীন' স্মৃতিনির্ভর ভ্রমণকাহিনিটি বঙ্গবন্ধুর প্রথম চীন সফরের অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত। এ ভ্রমণের সময় তিনি চীনের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেন। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে কারাগারে রাজবন্দি থাকাকালে বঙ্গবন্ধু তাঁর চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি ডায়েরি লেখেন, যেখানে তিনি তৎকালীন পাকিস্তান ও চীনের রাজনৈতিক-আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনা, কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে গণতন্ত্র চর্চা প্রভৃতি বিষয়াদি প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করেছেন। চীন সফরের এ ডায়েরিই বর্তমানে 'আমার দেখা নয়াচীন' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থটি লিখার পিছনে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছার অবদান ছিল অতুলনীয়। কেননা তাঁর প্রেরণায় বঙ্গবন্ধু তাঁর চীন সফরের অভিজ্ঞতা ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে এই লেখাগুলো সংগ্রহ ও সংরক্ষণে তিনি অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা'র ন্যায় 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তির পিছনেও রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। স্বাধীনতা

যুদ্ধের পূর্বে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি বঙ্গবন্ধুর নিজ বাড়িতেই সংরক্ষিত ছিল। অতঃপর মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটি পাক হানাদার বাহিনীর দখলে চলে যায়। এ বাড়িতেই একটি ড্রেসিংরুমের আলমারির উপরে অন্যান্য খাতাপত্রের সাথে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক লিখিত আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, ডায়েরি এবং ভ্রমণ কাহিনী ছিল। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনী সমগ্র বাড়িটি লুটপাট ও ভাঙচুর করলেও এই কাগজপত্রগুলোকে মূল্যহীন ভেবে অক্ষত অবস্থায় ফেলে রেখে যায়। পঁচাত্তরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর বাড়িটি জিয়া সরকার কর্তৃক সিলগালা করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৮১ সালে বাড়িটি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এ সময় ঐ বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকথা, ডায়েরি ও চীন ভ্রমণের খাতাগুলো খুঁজে পাওয়া যায়।

বঙ্গবন্ধুর চীন সফরের ডায়েরিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫২ সালের শান্তি সম্মেলনের কতিপয় ছবি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়াস্থ বঙ্গবন্ধুর গ্রামের বাড়িতে সংরক্ষিত ছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক বাড়িটি পুড়িয়ে দিলে ছবিগুলোও পুড়ে যায়। এছাড়াও ধানমণ্ডির বাসভবনেও কতিপয় ছবি সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু ১৯৭১ ও ১৯৭৫ সালে পরপর দুবার উক্ত বাড়িটি লুট হয়ে যাওয়ায় সেখানকার ছবিগুলোও পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায় চীনের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শী জিনপিং ও বাংলাদেশের জনাব তারিক সুজাত শান্তি সম্মেলনের অমূল্য কতিপয় ছবি, স্ট্যাম্প, পোস্টার সংগ্রহ করে দেন, যা উক্ত গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় সংযোজিত হয়েছে।

'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থটি ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ২০০, আইএসবিএন নম্বর ৯৭৮ ৯৮৪ ০৭৫ ৯৮৮০ এবং মূল্য চারশত টাকা। গ্রন্থটি নয়াচীন ভ্রমণ নামে প্রকাশের কথা থাকলেও পরবর্তীতে 'আমার দেখা নয়াচীন' নামে প্রকাশিত হয়। শিল্পী রফিকুন নবি ও পাবলো পিকাসোর লোগো অবলম্বনে গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ও নকশা অঙ্কন করেছেন তারিক সুজাত। গ্রন্থস্বত্ব জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। ইতোমধ্যে গ্রন্থটির প্রায় পঞ্চাশ হাজার কপি বিক্রি হয়েছে। ২০২০ সালের বই মেলায় এ গ্রন্থটি সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক ও লোক গবেষক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান।

'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থটিকে কয়েকটি ভাগে বিন্যস্ত করে সাজানো হয়েছে। যথা- খাতা পরিচিতি, ভূমিকা, আমার দেখা নয়াচীন, আমার দেখা

নয়াচীন খাতার নোটস্, জীবনপঞ্জি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫), আলোকচিত্রে শেখ মুজিবুর রহমানের আমার দেখা নয়াচীন ১৯৫২, টীকা ও নির্ঘণ্ট।

গ্রন্থটির সৌন্দর্যবর্ধনে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক লিখিত পাঁচ পৃষ্ঠার সমৃদ্ধ একটি ভূমিকা। ভূমিকাতে তিনি বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারাবরণের কথা তুলে ধরেছেন। এছাড়া ভূমিকাতে গ্রন্থটি লেখার কারণ ও সময়কাল, গ্রন্থটির বিষয়বস্তু, শান্তি সম্মেলনের ছবি সংগ্রহের ইতিহাস, গ্রন্থটি প্রণয়নে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছার অবদান ও গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

গ্রন্থটি প্রকাশে সার্বিক দায়িত্ব পালন, তত্ত্বাবধান ও কার্যক্রম পরিচালনা করেন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এবং বেবী মওদুদ। ২০২১ সালে বাংলা একাডেমি থেকে এর ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইংরেজি অনুবাদে শিরোনাম দেওয়া হয়েছে New China 1952 (নিউ চায়না ১৯৫২), যার ভাষান্তর করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম। এর আইএসবিএন নম্বর ৯৭৮ ৯৮৪ ০৭৬ ০৬৬৪ এবং মূল্য পাঁচশত টাকা। ২০২১ সালের অমর একুশে বইমেলায় এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থে যে সকল বিষয় উল্লিখিত হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ১৯৫২ সালে কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি লাভ, চীন সফরের প্রতি আগ্রহ, চীনের শান্তি সম্মেলনের খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ, বিশ্বনেতাদের সাক্ষাৎ, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সমাজসেবকসহ ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ, চীনের মহান নেতা মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে

চীনের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা, চীনা কৃষক-শ্রমিকের বাড়ি ও কর্মসংস্থান, চীনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চীনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নৌকা রিকশা ট্রেনে ভ্রমণ, তৎকালীন বার্মার (মিয়ানমার) আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার বর্ণনা, প্লেনে চড়ে আকাশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, মুসলমানদের ধর্মকর্ম অনুসন্ধান, চীনের ধর্মকর্ম অনুসন্ধান, হালাল খাবার গ্রহণ, ইসলামের প্রকৃত পরিচয়, আল্লাহ্‌র কাছে চীনের জন্য মঙ্গল কামনা, ঈমান রক্ষার উপায়, ইসলামে নারী অধিকার, ঘুষ, দুর্নীতি, চোরাকারবারির বিরোধিতা, ধর্মীয় ব্যবসার নিন্দা, ধর্মের নামে জুয়াচুরি-শোষণ না করা, মুসলিম ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, সংঘাত-হানাহানি পরিহার, ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণ, ঈমান-আকিদা, নয়াচীনে মুসলিম সামাজিক অবস্থা, বাংলাদেশের মুসলিম সামাজিক অবস্থা, আলেমের প্রকৃতি ও স্বরূপ, বেইমানদের পরিণতি, ধর্মীয় অপরাজনীতি, নয়াচীন সরকারের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, দুই পাকিস্তানের বৈষম্য, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর জুলুম-নির্যাতন, শাসকগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক আচরণের পরিণতি, ভারত-পাকিস্তানের কাশ্মীর সমস্যা, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশ্বের সকল সমস্যার সমাধান প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা এতে উপস্থাপিত হয়েছে।

'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থটির গুরুত্ব প্রসঙ্গে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার মন্তব্যটি উল্লেখ করা জরুরি বলে মনে করছি। তিনি লিখেছেন,

> "এই ভ্রমণকাহিনি যতবার পড়েছি আমার ততবারই মনে হয়েছে যে তিনি গভীর পর্যবেক্ষণ করেছেন প্রতিটি ক্ষেত্রে। তার কারণ হলো তাঁর ভিতরে যে সুপ্ত বাসনা ছিল বাংলার মানুষের মুক্তির আন্দোলন ও স্বাধীনতা অর্জন সেটাই বারবার ফুটে উঠেছে আমার মনে, এ কথাটাও অনুভব করেছি।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১৫)

বঙ্গবন্ধু তাঁর শিল্পিত মন ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের দ্বারা সদ্য বিপ্লবোত্তর গণচীনের শাসনব্যবস্থা ও জীবনচিত্র অত্যন্ত সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব, অসাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার গভীর পরিচয় মেলে। একজন তরুণ রাজনীতিকের মনন-পরিচয়, গভীর দেশপ্রেম এবং নিজ দেশকে গড়ে তোলার সংগ্রামী প্রত্যয় ফুটে উঠেছে রচনার পরতে পরতে। অপার সৌন্দর্যপ্রিয়তা, জীবন-সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি মুগ্ধদৃষ্টি এবং সঞ্জীবন-তৃষ্ণা এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। এছাড়া ভ্রমণ বিষয়ক একটি গ্রন্থে যে সকল উপাদান বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, সে সকল বিষয় উক্ত গ্রন্থে অত্যন্ত চমৎকার ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ভ্রমণ বিষয়ক এ গ্রন্থটি তথ্যবহুল লিখনীতে সমৃদ্ধ। কেননা বিভিন্ন বিষয়ে লেখার সময় তিনি

যথাসাধ্য তথ্য-উপাত্ত সংযোজন করে গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে সফল হয়েছেন।

কারাগারে বন্দি থাকাবস্থায়ও বঙ্গবন্ধু দুঃখী মানুষের জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। মূলত তাঁর চিন্তার জগৎ ছিল মননশীলতায় পূর্ণ। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো এভাবেই পূর্ণ হয় জাগতিক ভুবনের সৃজনশীলতার যাত্রা থেকে। এটা অবশ্যই লেখকের সিদ্ধি। তিনটি গ্রন্থ জুড়ে রয়েছে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ। গ্রন্থগুলোতে আমরা বঙ্গবন্ধুর জীবন-আদর্শ, ত্যাগের রাজনীতি, বাঙালির জাতীয় মুক্তি নিয়ে তাঁর স্বপ্ন ও দীর্ঘ সংগ্রাম প্রভৃতি বিষয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারি। গ্রন্থগুলোতে বঙ্গবন্ধুর সহজ ভাষাভঙ্গি, বিভিন্ন ঘটনাকে ছবির মতো ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা, মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ ও লেখার মধ্যে সরস প্রবাহ এই সবকিছুই তাঁর অনবদ্য রচনাশৈলীর প্রতীক, যা লেখক হিসেবে তাঁর সার্থকতাকে প্রকাশ করে। রাজনৈতিক জীবনে তিনি যেমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন তেমনি তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলোও পাঠক সমাজের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত ও ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। বাঙালি জাতির জন্য তাঁর তিনটি বই আকরগ্রন্থ বা মহামূল্যবান সম্পদ, বাঙালি মাত্রই যা অবশ্য পাঠ্য। পরিশেষে বলা যায় যে, তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহ দ্বারা বাংলাদেশের আপামর মানুষ উপকার লাভ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমার দেখা নয়াচীনে ধর্মীয় চিন্তাধারা

স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে বঙ্গবন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করতে হয়েছিল। এর মধ্যে চীন সফর ছিল অন্যতম। চীন সফরকালে তিনি সে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অবলোকন করেছিলেন। এছাড়া চীনা সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল বিধায় তিনি এ সম্পর্কে অবগতি লাভের নিমিত্তে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। তাঁর চীন সফরের অভিজ্ঞতার আলোকেই 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থটি লিখিত। এতে চীন সরকার কর্তৃক সে দেশ থেকে ধর্মীয় কুসংস্কার ও ধর্মীয় ব্যবসা কীরূপে দূরীভূত করা হয়েছিল তা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হয়েছে। নিম্নে অত্র গ্রন্থের আলোকে বঙ্গবন্ধুর ধর্মীয় চিন্তাধারা সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা প্রদত্ত হলো।

হালাল খাবার গ্রহণ

ইসলামের হালাল-হারামের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু খুবই সচেতন ছিলেন। এজন্য ভিনদেশে ভ্রমণের সময় হালাল খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে তিনি সতর্ক থাকতেন। পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে একবার চীন সফরকালে বঙ্গবন্ধুর দলনেতা ছিলেন

পীর মানকী শরিফ, যার প্রকৃত নাম পীর আমিনুল হাসনাত, যিনি পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রগতিশীল মুসলিম নেতা ছিলেন। পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলকে যেন কোনরূপ হারাম খাবার গ্রহণ করতে না হয় সেজন্য তিনি পূর্বেই চীন সরকারকে এ বিষয়ে অবহিত করে দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর লেখায়ও আমরা সে বিষয়ের প্রতিফলন দেখতে পাই। তিনি লিখেছেন,

> "আমাদের খাওয়া চললো। চীনদেশের ডিনার। আমরা মুসলমান বলে আমাদের যে যে জিনিস খেতে নিষেধ আছে, তাহা বাদ দিয়ে করা হয়েছে; মুরগি, ডিম, তরিতরকারি, চিংড়ি মাছ ও অন্যান্য মাছও ছিল। আমাদের যা যা ভালো লাগলো খেলাম। তারপর অনেক গল্প চললো। তারাও আমাদের দেশের খবর জানতে চায় আর আমরাও তাদের খবর জানতে গিয়েছি।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ৩৩)

অন্যত্র বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

> "রাত্রে আমাদের পাকিস্তান ডেলিগেটদের সভা হবে, খাবার পরেই। পীর সাহেব বলে দিয়াছেন মুসলমানের পাক খাবেন, তাই আমাদের জন্য এক মুসলমান হোটেলে খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। রাত্রে সেখানে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের 'আসসালামু আলাইকুম' বলে অভ্যর্থনা করলো। আমরা 'ওয়ালাইকুম আস্ সালাম' বলে উত্তর দিলাম।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ৩৬-৩৭)

বঙ্গবন্ধু আরও লিখেছেন,

> "সন্ধ্যার পর আমরা ফিরে এলাম হোটেলে। আমাদের জন্য হ্যাংচো শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে খাওয়ার আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। আমার পাশে যিনি খাওয়ার জন্য বসেছিলেন তিনি একজন বড় সরকারি কর্মচারী হবেন। ইংরেজি জানেন। কথায় কথায় জানতে পারলাম, আমাদের জন্য যে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেগুলি মুসলমান বাবুর্চি দ্বারা পাক করানো হয়েছে। কর্মচারী বললেন, "আমরা মুসলমান বাবুর্চি জোগাড় করেছি কারণ, আপনারা মুসলমান। যে যে জিনিস আপনাদের খেতে নিষেধ আছে সেগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনারা কী করে জানেন কী কী জিনিস আমরা খাই না?" তিনি বললেন, "কেন? আমাদের দেশের মুসলমানরা অনেক জিনিস খায় না। আমরা পাশাপাশি যুগ যুগ ধরে বাস করছি। আমরা জানি মুসলমানদের কোন কোন জিনিস খাওয়া নিষেধ। আমাদের কোন কোন জিনিস নিষেধ তাহা মুসলমানরাও জানে।" ওদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা করা হলো। আর আমাদের পক্ষ থেকে উত্তর দেওয়া হলো। পীর সাহেব বক্তৃতা করলেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ৮২-৮৩)

মুসলমানদের ধর্মকর্ম অনুসন্ধান

চীন সফরকালে বঙ্গবন্ধু সে দেশে ইসলাম ধর্ম পালন সম্পর্কে খুঁটিনাটি সকল বিষয়ের খোঁজ-খবর নিয়েছেন। এমনকি সশরীরে তিনি বিভিন্ন মুসলিম মহল্লায় উপস্থিত হয়ে তাদের ধর্মপালন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এক্ষেত্রে নয়াচীনের কম্যুনিস্ট সরকার কর্তৃক মুসলমানদের ধর্ম পালনে কোনরূপ বাধা প্রদান করে কি না, মুসলিম সম্প্রদায় নিয়মিত নামাজ আদায় করে কি না প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধানমূলক আচরণ ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"মাঝে মাঝে আমি ও ইলিয়াস বেরিয়ে পড়তাম। স্কুল দেখতে যেতাম, মসজিদ দেখতে যেতাম। এক মুসলমান পাড়ায় যাই। তখন নামাজের সময় একটা মসজিদে কয়েকজন মুসলমান নামাজ পড়ছে। নামাজ শেষ হওয়ার পর আমার দোভাষী ওদের কাছে যেয়ে বললো, দেখ ইনি মুসলমান, শান্তি সম্মেলনে এসেছেন পাকিস্তান থেকে। ২/৩ জন আমার কাছে এলো, এসে আমাকে 'আস্সালামু আলাইকুম' দিয়া দাঁড়ালো। কী যেন জিজ্ঞাসা করলো, আমি বুঝলাম না। দোভাষীর দিকে তাকালাম। দোভাষী আমাকে বললো, কেমন আছেন? আপনাদের দেশ কেমন? আমি বললাম, খুব ভালো। তারা বললো, 'আপনাদের দেশের লোক নামাজ পড়ে'? আমি বললাম, 'খুব পড়ে। সকলেই প্রায় নামাজ পড়ে'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারা সবাই নামাজ পড়েন'? ওরা বললেন, 'কেহ কেহ পড়ে, সকলে তো পড়ে না'। 'আপনাদের কম্যুনিস্ট সরকার নামাজ পড়তে দেয়'? ওরা খেপে বললো, 'সব মিথ্যা কথা আপনারা শুনেছেন, আমরা নামাজ পড়ি, কুরআন পড়ি। ছেলেমেয়েদের কুরআন শিখাই। কেউ আমাদের বাধা দেয় না। আমরা খুব ভালো আছি'। দোভাষী আমাকে বুঝাইয়া দিলো। ভাবলাম, বোধ হয় ভয়েতে বললো। আরও খোঁজ নিতে হবে। তারপর প্রায় একা বেরুতাম। কী করবো? কথা বুঝি না, ভাবেসাবে যতদূর বোঝা যায় ও জানা যায়।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ৪৯-৫০)

বঙ্গবন্ধু আরও লিখেছেন,

"আমি নিজে চেষ্টা করেছিলাম– ভালোভাবে জানবার জন্য, মুসলমানদের অবস্থা কী, তারা এই সরকারের হুকুমতে কেমন আছে? কী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে! পরে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলাম,

নয়াচীন সরকার কারও ধর্মকাজে বাধার সৃষ্টি করে না এবং যদি কোনো সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ওপর বা তাদের ধর্মকাজে বাধার সৃষ্টি করে, তাহলে তাদের কঠোর হস্তে দমন করা হয়। এ রকম অনেক ঘটনার কথা আমাকে অনেক মুসলমান বলেছেন। আমরা নিজেরা মসজিদে গিয়াছি, সেখানে মুসলমানরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। প্রত্যেক মসজিদে ইমাম আছে যারা ছেলেমেয়েদেরকে কুরআন হাদিস শিক্ষা দেয়।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১১২-১১৩)

চীনা সংস্কৃতিতে মসজিদ

চীন বিপ্লবের পর পুরো দুনিয়ায় এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল যে, চীনদেশে ধর্ম অবলুপ্ত করা হয়েছে। এ কারণেই বঙ্গবন্ধুর মধ্যেও বেশ কৌতূহল ছিল এ বিষয়ের প্রকৃত খবর জানার জন্য। তাই তো চীনে অবস্থানকালে যখনই কোন মুসলিম বিষয় তাঁর চোখে পড়েছে তখনই তিনি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

> "আমরা যথারীতি বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লাম। বোরহান শহীদ চীনের মুসলমানদের পক্ষ থেকে আমাদের একটা বই উপহার দিলেন। তার মধ্যে মুসলমানদের মসজিদ, স্কুল, কলেজ ও অনেক বিষয়ের ফটো আছে।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ৬৪)

জামে মসজিদের ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ

বঙ্গবন্ধু তাঁর চীন সফরকালে ইসলাম ও মুসলিম বিষয়ে বহু অনুসন্ধান করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় একদিন এক ভোজসভায় নয়াচীনের একটি জামে মসজিদের ইমামের সঙ্গে তাঁর দলের সাক্ষাৎ হয়। এ সময় ইমাম সাহেবের সাথে তাঁরা ইসলামী বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। বঙ্গবন্ধুর লিখনীতে বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

> "এখানকার শান্তি কমিটি আমাদের একটা ভোজ দিলো আর সেই সঙ্গে কিছু জিনিসপত্র উপহার। চীনে খাওয়া আর উপহার এটা আপনাদের গ্রহণ করতেই হবে। আমাদের পক্ষ থেকে পীর সাহেব ধন্যবাদ দিলেন। এখানে জামে মসজিদের ইমাম সাহেব, আমাদের যে ভোজসভা দেওয়া হয়েছিল– সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ছোটখাটো লোকটা, মাথায় টুপি, অল্প কয়েকগোছা দাড়ি, চীনা প্যান্ট কোট পরা। 'আস্সালামু আলাইকুম' দিয়া উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি পীর সাহেবের পাশে বসলেন। ফারসি জানেন, দু'জনেই ফারসিতে আলাপ করলেন। কী আলাপ করলেন তখন বুঝতে পারলাম না। পরে পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, অনেক কথা বললো। তার মধ্যে মূল কথাটুকু হলো যে, ধর্ম কাজে এরা কোনো বাধা দেয় না। আমরা আমাদের ইচ্ছামতো নামাজ রোজা করতে পারি। ছেলেমেয়েদের কুরআন হাদিস পড়াতে পারি, কোনো অসুবিধা নাই। আমি বললাম, তাহলে আমরা যা শুনেছি তা মিথ্যা। পীর সাহেব হেসে বললেন, "সত্য মিথ্যা খোদা জানেন।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ৬৫)

ইসলামের প্রকৃত পরিচয়

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দলের সহকর্মীরা চীন সফরকালে চীনের একটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁদের দলের পক্ষে বক্তৃতা করেছিলেন পীর মানকী শরিফ। তিনি ইসলাম ও ইসলামী ঐতিহ্য বিষয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

> "আমাদের দলনেতা পীর সাহেব বক্তৃতা করলেন: "আমরা পাকিস্তানি, ইসলাম ধর্মে অধিকাংশ লোক বিশ্বাসী, ইসলাম অর্থ শান্তি, আমরাও চাই দুনিয়ায় শান্তি কায়েম হউক। অত্যাচার, অবিচার দুনিয়া থেকে মুছে যাক। আমরা যে স্নেহ ও ভালোবাসা আপনাদের কাছ থেকে পেলাম তা কখনও ভুলবো না। যে কষ্ট করে আপনারা আমাদের সকল কিছু দেখালেন, সে জন্য আমি আমার ডেলিগেটদের পক্ষ থেকে আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ৬৭)

অন্যত্র বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"ইসলামের মূল কথা শান্তি, ঈমান, বিশ্বভ্রাতৃত্ব। সেখানে ধর্মযাজকদের দ্বারা শান্তির পরিবর্তে দেখা দিলো অশান্তি, ঈমানের পরিবর্তে বেঈমানি, বিশ্বভ্রাতৃত্বের জায়গায় দেখা দিলো ভাই ভাইকে শোষণ বা নির্যাতন করা।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১১১)

মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা

মাতৃভাষার প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা ছিল অতুলনীয়। মাতৃভাষার অধিকার আদায়ে তিনি বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এমনকি এজন্য তাঁকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত কারাগারে বন্দি থাকতে হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও মাতৃভাষার অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে তিনি পিছপা হননি। মাতৃভাষার প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা কীরূপ ছিল, তা তাঁর বিভিন্ন লিখনী থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"ভাইস চ্যান্সেলর চীনা ভাষায় বললেন, দোভাষী ইংরেজি করে দিলেন। এখানেই আমি দেখলাম যে, দোভাষী যখন ২/১ জায়গায় ভালোভাবে ইংরেজি বলতে পারছে না, সেখানে ভাইস চ্যান্সেলর নিজেই ওকে ইংরেজি করে দিচ্ছে। ভদ্রলোক ভালো ইংরেজি জেনেও ইংরেজি বলেন না। জাতীয় ভাষায় কথা বলেন। আমরা বাঙালি হয়ে ইংরেজি আর উর্দু বলার জন্য পাগল হয়ে যাই। বলতে না পারলেও এদিক ওদিক করে বলি।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ৬৮)

আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ

বঙ্গবন্ধু আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ তথা যিকির-আযকারে নিয়োজিত থাকতেন। আমার দেখা নয়াচীন গ্রন্থেও অনুরূপ একটি কথার অবতারণা করে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"আমার আবার পরিচয় কী? কী বলতে পারি? বললাম, এমনি ঘুরে বেড়াই, দেশ বিদেশ দেখি। মনে মনে বলি, 'আমার আবার পরিচয়? পথে পথে ঘুরে বেড়াই, বক্তৃতা করে বেড়াই। আর মাঝে মাঝে সরকারের দয়ায় জেলখানায় পড়ে খোদা ও রাসূলের নাম নেবার সুযোগ পাই। এই তো আমার পরিচয়।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ৭৩)

চীনের ধর্মকর্ম অনুসন্ধান

বঙ্গবন্ধু তাঁর চীন সফরকালে সেখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ধর্মকর্মের অবস্থা কীরূপ? তা বোঝার জন্য অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছিলেন। আর তাঁর এ অনুসন্ধান শুধু ইসলাম বা মুসলিম ধর্ম বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং অন্যান্য ধর্মকর্ম

সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন। একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান সফরকালেও তিনি এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

> "আমরা আর কয়েকটা জায়গা দেখলাম। বহু দূরে একটা বৌদ্ধ উপাসনাগার দেখতে পেলাম। বহুদিনের পুরানো স্মৃতি। অনেক যত্নে রাখা হয়েছে। হাজার হাজার লোক বৎসরে এখানে উপাসনা করতে আসে।
>
> আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনাদের দেশের লোক কি ধর্মকর্ম করে?" একজন উত্তর করলো, "সকলেই আমরা ধর্ম পালন করে থাকি। আমাদের কেহ বাধা দেয় না। আর নিষেধও করে না, আর নিষেধ করলেই আমরা শুনবো কেন? আমাদের সরকার ধর্মকর্ম করতে কাহাকেও বাধা দেয় না।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ৭৯)

আল্লাহ্‌র কাছে চীনের জন্য মঙ্গল কামনা

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত। এজন্য তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ সকলের মঙ্গল কামনা করতেন। একারণেই আমরা দেখতে পাই যে, তিনি চীন সফরকালে তাদের আচার-ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে চীনের মঙ্গল কামনায় এই বলে দোয়া করেছিলেন যে, "চীন যেন দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত হয়।" এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

> "আমি তার কাছ থেকে এবং সকলের কাছ থেকে এক এক করে বিদায় নিয়া রওয়ানা করলাম। যতদূর দেখা গেল, আমাদের হাত তুলে অভিবাদন জানালো। তাদের ছেড়ে আসতে খুব খারাপ লাগলো। অনেক ভাবলাম– কবে আর আসি সুযোগ জীবনে নাও আসতে পারে! তবু মনে মনে খোদার কাছে প্রার্থনা করলাম, এ কথা বলে, "খোদা তুমি এদের মঙ্গল করিও। এরা যেন এদের দেশকে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। আর আমাদের দেশকেও যেন আমরা সোনার দেশে পরিবর্তন করতে পারি। আমাদের জনগণও যেন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারে। পাশাপাশি দু'টো রাষ্ট্র যেন যার যার আদর্শ নিয়া গড়ে ওঠে।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ৮৪)

ঈমান রক্ষার উপায়

সামাজিক বিভিন্ন অপরাধ সমাজ বা রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণের পক্ষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। দেশ, জাতি ও শান্তিময় বিশ্ব গঠনের লক্ষ্যে সামাজিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণের কোন বিকল্প নেই। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, সামাজিক বিভিন্ন অপরাধের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক প্রভাব। অর্থনৈতিক অবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে দরিদ্র ব্যক্তিদেরকে অপরাধের দিকে প্রভাবিত করে। দারিদ্র্য তথা সম্পদের

চাহিদা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অপরাধ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মূলত দারিদ্রতার কারণে মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে গবির মানুষ বিভিন্ন প্রকারের অপরাধে লিপ্ত হয়ে থাকে।

চীন প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু সমকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন সমস্যা উল্লেখ করে তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন। অতঃপর উক্ত সমস্যাসমূহ চীন কীভাবে মোকাবিলা করেছে সে অভিজ্ঞতার কথাও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। এতদপ্রসঙ্গে তিনি এদেশের তৎকালীন দুর্ভিক্ষ ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলে লিখেছেন,

> "এমনকি ১৯৫৩ সালে খুলনার দুর্ভিক্ষের সময় সাতক্ষীরা মহকুমায় যখন মওলানা ভাসানী সভা করতে যান, তখন গরিব মেয়েরা এসে মওলানা সাহেবকে বলেছে, "হুজুর, এখন আর কেউ আমাদের ভিক্ষাও দেয় না। তাই স্বামীর অনুমতিতে ইজ্জত দিয়ে কোনো রকমে এক বেলা বা একদিন পরে একদিন চারটা খাই।"
>
> পেটে খাবার না থাকলে কোনো ধর্ম কথায়ই মানুষ ঈমান রাখতে পারে না। পেটের দায়ে মানুষ নর্দমা থেকে কুড়াইয়া খায়। যখন মা দেখে যে তার ছেলেমেয়ে কলিজার কলিজা, না খেয়ে এবং বিনা ওষুধে আস্তে আস্তে কোলে বসে শুকিয়ে শুকিয়ে মারা যায়, অথচ একটু খাবার দিলেই তার কলিজার ধন বাঁচতে পারে, কিন্তু কোনো উপায় নাই; ভিক্ষাও পাওয়া যায় না, তখন তার পক্ষে ইজ্জত দিয়ে খাবার জোগাড় করতে একটু দ্বিধা হয় না। তাই চিয়াং কাইশেকের চীনের মেয়েরা পেটের দায়ে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ৯৬)

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার

সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি বঙ্গবন্ধু তাঁর চীন সফরে পরখ করেছিলেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে লিখেছেন,

> "নয়াচীনে আজকাল পূর্বের মতো মেয়েদের বাবা মায়ের টাকা দিয়া আর জামাই কিনতে হয় না। তাহারা নতুন বিবাহ আইন প্রবর্তন করেছে। ছেলেমেয়ে একমত হয়ে দরখাস্ত করলেই তাদের যার যার ধর্মানুযায়ী বিবাহ দিতে বাধ্য। 'পুরুষ শ্রেষ্ঠ আর স্ত্রী জাতি নিকৃষ্ট' এই পুরানো প্রথা অনেক দেশে বহুকাল থেকে চলে আসছে, তাহা আর নয়াচীনে নাই। আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাই আজ নয়াচীনে সমস্ত চাকরিতে মেয়েরা ঢুকে পড়ছে। পুরুষদের সাথে তাল

মিলিয়ে কাজ করছে। প্রমাণ করে দিতেছে পুরুষ ও মেয়েদের খোদা সমান শক্তি দিয়েই সৃষ্টি করেছে। সুযোগ পেলে তারাও বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, ডাক্তার, যোদ্ধা সকল কিছুই হতে পারে। নয়াচীনের বহু পূর্বে পাশ্চাত্য দেশগুলি, বিশেষ করে গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি এমনকি মুসলিম দেশ তুরস্ক নারী স্বাধীনতা স্বীকার করেছে। নারীরা সেদেশে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। তুরস্কে অনেক মেয়ে পাইলট আছে, যারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ পাইলটদের মধ্যে অন্যতম।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ৯৯)

ইসলামে নারী অধিকার

নারীর অধিকার আদায় ও পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সবসময় সোচ্চার ছিলেন। কেননা তিনি ইসলামের প্রকৃত মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"নয়াচীনে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার কায়েম হওয়াতে আজ আর পুরুষ জাতি অন্যায় ব্যবহার করতে পারে না নারী জাতির ওপর। আমাদের দেশের কথা চিন্তা করে দেখুন। যদিও আইনে আমাদের দেশে নারী-পুরুষের সমান অধিকার, তথাপি আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকের মনে এই ধারণা যে, পুরুষের পায়ের নিচে মেয়েদের বেহেশত। পুরুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। মেয়েদের নীরবে সব অন্যায় সহ্য করতে হবে বেহেশতের আশায়। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, মেয়েদের নির্ভর করতে হয় পুরুষদের অর্থের ওপর। কারণ আমাদের দেশে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত কিছু সংখ্যক মোল্লা পর্দা পর্দা করে জান পেরেশান হয়ে যায়। কোনো পরপুরুষ যেন মুখ না দেখে। দেখলে আর বেহেশতে যাওয়া হবে না। হাবিয়া দোজখের মধ্যে পুড়ে মরবে। আমার দেশের সরলপ্রাণ গরিব অশিক্ষিত জনসাধারণ তাদের কথা বিশ্বাস করে আর বেহেশতের আশায় পীর সাহেবদের পকেটে টাকা গুঁজে দেয়, আর তাদের কথা কুরআন হাদীসের কথা বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু ইসলামিক ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে, মুসলমান মেয়েরা পুরুষদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে যেত, অস্ত্র এগিয়ে দিতো। আহতদের সেবা শুশ্রূষা করতো। হযরত রাসূলে করিমের (সা) স্ত্রী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) নিজে বক্তৃতা করতেন, 'দুনিয়ায় ইসলামই নারীর অধিকার দিয়াছে'।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ৯৯-১০০)

চার বিয়ে সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামী শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিধান সম্পর্কেও বঙ্গবন্ধু জ্ঞান রাখতেন। এজন্যই তাঁর লিখনীর বিভিন্ন পর্যায়ে কুরআন-হাদীস এবং নবী-রাসূল

ও সাহাবীগণের কাহিনির উদ্ধৃতি পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কিত একটি বিষয় সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

> "কুরআনে একথা কোথাও নাই যে, চার বিবাহ করো। কুরআন মাজিদে লেখা আছে যে, এক বিবাহ করো। তবে তুমি দুই বা তিন বা চারটা পর্যন্ত বিবাহ করতে পারো যদি সকল স্ত্রীকে সমানভাবে দেখতে পারো। কিন্তু আমি প্রশ্ন করি, এমন কোনো মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে কি যে সমানভাবে সকল স্ত্রীকে দেখতে পারে? কোনোদিন পারে না। তাই যদি না পারে তবে চার বিবাহ করতে পারে না। আল্লাহ্‌র হুকুম সেখানে অমান্য করা হয়।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১০০)

অন্যত্র বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

> "বসে বসে টাকা নেওয়া আর চারটা করে বিবাহ করা নয়াচীনে এখন আর চলে না, যা আমাদের দেশে সচরাচর চলে থাকে।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১১৩-১১৪)

ঘুষ, দুর্নীতি, চোরাকারবারির বিরোধিতা

বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন প্রকৃত মুসলমান এবং দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। এজন্যই তিনি দুর্নীতি ও দুর্নীতিবাজদের সহ্য করতে পারতেন না। দুর্নীতির করুণ পরিণতি সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন বিধায় সর্বদা দুর্নীতি ও দুর্নীতিবাজদের বিরোধিতা করেছেন। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন বক্তৃতা ও ভাষণের মাধ্যমেও তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি ইসলাম নির্দেশিত বিভিন্ন অবৈধ কার্যাবলি সম্পর্কে সচেতন করতেন এবং এসকল অবৈধ কর্মের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করতেন। এক্ষেত্রে তিনি নিজে যেমন দুর্নীতি থেকে মুক্ত ছিলেন তেমনি সাধারণ মানুষকেও দুর্নীতি থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বদা চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

> "নয়াচীন থেকে দুর্নীতি তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, রাষ্ট্রের কর্ণধাররা ঘুষ দুর্নীতি তুলে দিতে বদ্ধপরিকর। আমি নয়াচীনে একটা ঘটনা শুনেছিলাম যে, মাও সে তুংয়ের একজন প্রধান বন্ধু এবং নয়াচীনের নেতা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছিল বলে তাকে বিচার করে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। ইচ্ছা করলে মাও সে তুং তাকে রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু বিচারে যাকে ফাঁসির হুকুম দিয়েছে তাকে রক্ষা করা অন্যায়। ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফাদের সময় এইভাবে ভাইকেও অন্যায় করলে খলিফারা ক্ষমা করতেন না। দরকার হলে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করতেন। এরকম বহু ইতিহাস আছে। দুঃখের বিষয় কয়েকজন মুসলমান নামধারী নেতা পবিত্র ইসলামের নাম ব্যবহার করে দুর্নীতি,

ঘুষ ও চোরাকারবারিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। নিজেরাও অনেক লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছে। দেশের রাষ্ট্রনায়করা যদি দুর্নীতিপরায়ণ হয় তবে আর দেশের কর্মচারী ও জনগণ দুর্নীতিপরায়ণ কেন হবে না?

দুর্নীতি সমাজের ক্যানসার রোগের মতো। একবার সমাজে এই রোগ ঢুকলে সহজে এর থেকে মুক্তি পাওয়া কষ্টকর। আমাদের দেশের বিচারে একটা লোক আর একজনকে হত্যা করলে বিচারে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ডাকাতি করলে বা চুরি করলে তাকে কয়েক বৎসর ধরে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একটা লোক হঠাৎ রাগের বশবর্তী হয়ে আর একটা লোককে হত্যা করলো, যাকে হত্যা করা হয় তার সংসারটা খতম হয়ে যায়। কারণ, সেই লোকটার ওপর সমস্ত সংসার নির্ভর করে। কিন্তু চোরাকারবারিকে ফাঁসি দেওয়া হয় না, ফাঁসি যদি কাহাকেও দিতে হয়, তবে চোরাকারবারি ও দুর্নীতিপরায়ণ লোকদেরই দেওয়া উচিত। একজন চাউলের চোরাকারবারি লক্ষ লক্ষ মন চাউল জমা রেখে লক্ষ লক্ষ লোককে না খাইয়ে মারে। আর একজনকে হত্যা করলে যদি ফাঁসি হয়, তবে হাজার হাজার লোকের যারা মৃত্যুর কারণ তাদের কী বিচার হওয়া উচিত? ধরুন, একজন কাপড়ের চোরাকারবারির জন্য অনেক মহিলা ইজ্জত রক্ষা করার সামান্য কাপড় জোগাড় করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। তবে তার বিচারে কী হবে? সে তো লক্ষ লক্ষ নারীর ইজ্জত ও জীবন নষ্ট করেছে। আমি জানি আমাদের দেশের এক স্বনামধন্য মুসলিম লীগওয়ালা একমাত্র কাপড়ের চোরাকারবার করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছে। তবে ইলেকশনে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেও ভোট পান নাই। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য সরকারি কর্মচারীরা চেষ্টা করেছিল, তখন তাদের বদলি করে দিয়ে সেই চোরাকারবারিকে রক্ষা করা হয়েছিল। এমনকি শোনা যায়, ফাইলগুলি পূর্ব বাংলা থেকে উড়ে করাচি চলে গিয়াছিল এবং কোনো এক মন্ত্রীর বাক্সের মধ্যে ফাইলগুলি আটকাইয়া রাখা হয়েছিল। এতবড় যেখানে দুর্নীতি সেখানে সরকারি কর্মচারীরা কোন সাহসে বড় বড় চোরাকারবারিদের গায়ে হাত দেবে?" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১০৪-১০৫)

অন্যত্র বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"নয়াচীন থেকে ঘুরে এসে আমার এই মনে হয়েছে যে, জাতির আমূল পরিবর্তন না হলে দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করা কষ্টকর। নতুন করে সকল কিছু ঢেলে সাজাতে হবে। ভাঙা দালানে চুনকাম করে কোনো

লাভ হয় না– বেশি দিন টিকে না। আবার ভেঙে পড়ে। পুরান দালান ভেঙে ফেলে দিয়ে নতুন করে গড়ে তুললে ঘুণ ধরতে বা ভেঙে পড়তে অনেক সময় লাগে। সাথে সাথে ভিত্তিটা মজবুত করতে হয়। ভিত্তি মজবুত না হলে সামান্য বাতাসে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই, নয়াচীনে দেখেছি তারা ভিত্তি মজবুত করে কাজ শুরু করেছে।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১০৭)

ধর্মীয় ব্যবসার নিন্দা

বাংলাদেশেও সুদীর্ঘকাল যাবৎ একপ্রকার মন্দ ব্যক্তি অসৎ উপায়ে ধর্মীয় ব্যবসায় লিপ্ত। তারা ইসলামকে পুঁজি করে সাধারণ মানুষ থেকে বিভিন্ন অর্থ আত্মসাতে নিমজ্জিত। এসকল অসাধু ব্যক্তিদের মুখোশ উন্মোচন করে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"আমার দেশের এক নেতা একদিন আমার কাছে গর্ব করে বলেছিলেন যে, তাঁর জামাই এক পয়সা বাড়ির থেকে না নিয়ে ব্যবসা করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছে। আমি একটু মুখপোড়া মানুষ, মনে যা আসে এবং তা সত্য হলে মুখের ওপর বলে দিই। কাউকেও ভয় করি না। আর চক্ষুলজ্জা একটু কম। বললাম, "বিনা টাকায় ব্যবসা হয় এটা তো জানতাম না!" তবে হয়, আমাদের দেশের পীর সাহেবদের ফুঁ দিয়া ধর্মের কথা বলে মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বড় বড় ঘর করে ও জমি কেনে, কোনো কাজকর্ম করে না। এটা একটা ব্যবসা। আর একটা ব্যবসা রাতে ঘরে সিং কাটা অথবা ডাকাতি করা। যাতে কোনো অর্থের প্রয়োজন হয় না। আর একটা ব্যবসা আছে যেটা বিনা টাকায় হয় সেটা বেশ্যাবৃত্তি করা। এছাড়া বিনা টাকায় কোনো ব্যবসা হয় বলে আমার জানা নাই।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১০৬-১০৭)

অন্যত্র বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"ইমাম সাহেবরা বেতন পান। তাদের আমাদের দেশের মতো না খেয়ে ইমামতি করতে হয় না; আর পেট বাঁচানোর জন্য মিথ্যা ফতোয়া দেওয়া লাগে না। আর তাবিজ কবজ, ফুঁ-ফাঁ দিয়ে পয়সা নিতে হয় না এবং এই সমস্ত টাকা গ্রহণ করা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১১২-১১৩)

ধর্মের নামে জুয়াচুরি

চীনের ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু দুটি সময়ের তুলনামূলক আলোচনার অবতারণা করেছেন। চিয়াং কাইশেকের চীন ও নয়াচীনের মধ্যে বহু পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যে চীনে একসময় ধর্মের নামে বহু সাম্প্রদায়িক

দাঙ্গা হাঙ্গামায় হাজার হাজার নিরীহ লোক মারা যেত, এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়ের ওপর অন্যায়ভাবে অত্যাচার-নির্যাতন করত, ধর্মের নামে জুয়াচুরি চলত, ধর্মীয় কুসংস্কার দেশের সর্বত্র বিরাজমান ছিল, পরবর্তী সময়ে সে চীনে এগুলো কল্পনাও করা যেত না বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এমনকি তিনটি বৃহৎ ধর্মীয় সম্প্রদায় শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রেখে একত্রে বসবাস করত। তাদের মধ্যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টি হতো না। নয়াচীনের এরূপ পরিবর্তন সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে লিখেছেন,

> "আমাদের জানা আছে চীন দেশ ৬০ কোটি লোকের দেশ। তিন সম্প্রদায়ের লোকেরা সে দেশে বাস করে। শতকরা প্রায় ৮০ জনই বৌদ্ধ, প্রায় ৫ কোটি মুসলমান আর কিছু খ্রিষ্টান। কয়েকটা প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি, এমনকি শতকরা প্রায় ৯০ জন মুসলমান। আর অন্যান্য প্রদেশেও মুসলমান কিছু কিছু আছে। চিয়াং কাইশেকের সময় বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা হতো। হাজার হাজার নিরীহ লোক মারা যেত। এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার চালাতো। ধর্মের নামে বহু জুয়াচুরি চলতো। কুসংস্কার দেশের মধ্যে অনেক বেশি ছিল।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১০৭)

ধর্মের নামে শোষণ

তৎকালীন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্মের নামে অপরাজনীতি ব্যাপক প্রচলিত ছিল। এজন্যই দেখা যায় যে, ধর্মকে পুঁজি করে শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সাধারণ জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করত। জনগণ তাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করলে শাসকগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করত। যেন গণআন্দোলনকে অন্যদিকে ধাবিত করা যায়। এক্ষেত্রে চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে বঙ্গবন্ধু অনেক সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছিলেন। কেননা ধর্মের নামে এ দুটি দেশে একসময় শাসন, শোষণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে চীন তা দূর করতে পারলেও পাকিস্তান তা থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

> "তখন ধর্মের নামে শোষণ চলতো। ধর্মকে ব্যবহার করা হতো শোষক সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য। শুধু মুসলমান ধর্মের মধ্যেই এই প্রবণতা ছিল না, প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই ছিল। সকলের চেয়ে বেশি ছিল বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে। রাষ্ট্রনায়করা বৌদ্ধ ধর্মের রক্ষাকর্তা হিসাবে দেশকে ধর্মের নামে শাসন ও শোষণ করতো এবং ধর্মকে ব্যবহার করতো নিজেদের স্বার্থের জন্য। বৌদ্ধ ধর্মের অহিংস নীতি তখন আর ছিল না, সেটা

হিংসায় পরিণত হয়েছিল। হাজার হাজার লোককে গুলি করে হত্যা করে চিয়াং কাইশেকের দল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগিয়ে রাখতো নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। এটা শোষক সম্প্রদায়ের নীতি। জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখতো। যখন জনগণের ভিতর গণআন্দোলন শুরু হতো, তারা ভাত-কাপড় দাবি করতো, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য বদ্ধপরিকর হতো, তখনই শোষকগোষ্ঠী এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিতো, যাতে তাদের গণআন্দোলনকে অন্যদিকে ধাবিত করতে পারে এবং দেখা যেত অশিক্ষিত জনসাধারণ নিজেদের বাঁচবার দাবি ভুলে যেয়ে সম্প্রদায়গত স্বার্থকে বড় করে দেখতো। এটা শোষক গোষ্ঠীর নিয়ম। যুগ যুগ ধরে এই নিয়ম জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তারা তাদের শোষণ ও শাসন চালাতো।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১০৮)

অন্যত্র বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"ইসলামের মূল কথা শান্তি, ঈমান, বিশ্বভ্রাতৃত্ব। সেখানে ধর্মযাজকদের দ্বারা শান্তির পরিবর্তে দেখা দিলো অশান্তি, ঈমানের পরিবর্তে বেঈমানি, বিশ্বভ্রাতৃত্বের জায়গায় দেখা দিলো ভাই ভাইকে শোষণ বা নির্যাতন করা।

যেমন বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং মহামতি বুদ্ধ অহিংস নীতি প্রচার করেছিলেন– সেখানে দেখা দিলো হিংসা, ঘৃণা, অত্যাচার, অবিচার ও শোষণ।

তেমনি আবার দেখা দিলো খ্রিষ্টধর্মের মধ্যে, যেখানে ক্রাইস্ট বলে দিয়েছেন, 'এক মুখে আঘাত করলে আরেক মুখ এগিয়ে দাও, ক্ষমাই মহত্ত্বের লক্ষণ'। কিন্তু খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসীরা দুনিয়ার অনুন্নত দেশগুলিকে শোষণ করার জন্য যুদ্ধ করে। নয়া নয়া অস্ত্র তৈরি করে, তার দ্বারা জনসাধারণকে হত্যা করে, সেই দেশগুলিকে শাসন করার নামে শোষণ করে। দরকার হলে লক্ষ লক্ষ নিরীহ লোককে বোমা মেরে হত্যা করে। গ্রামের পর গ্রাম উচ্ছেদ করে। এরাই আবার দুনিয়ায় প্রচার করে, 'আমরা খ্রিষ্টান'। এরা কি জেসাস ক্রাইস্টকে অপমান করে না?

যেমন, আমরা মুসলমানরাও কি অসম্মান করি না দুনিয়ার শেষ নবী হযরত রাসূলে করিমকে (সা) তাঁর আদর্শ পালন না করে তাঁর নাম ব্যবহার করি মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য।

তেমনি ভারতের দিকে চেয়ে দেখুন, হিন্দুধর্মের রক্ষকরা জায়গায় জায়গায় মুসলমানদের হত্যা করছে ধর্মের নামে। এক হিন্দু অন্য হিন্দুর ছোঁয়া পানি পর্যন্ত খায় না, কারণ জাত যাবে!

চীন দেশের অধিকাংশেরও বেশি লোক বৌদ্ধ। তারা সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের নামের দোহাই দিয়ে নিরীহ মুসলমানদের ওপর, খ্রিষ্টানদের ওপর অত্যাচার করেছে। চিয়াং কাইশেক সরকার এই অত্যাচার কোনোদিন বন্ধ করতে পারে নাই অথবা চেষ্টা করে নাই।

সরকার ইচ্ছা করলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ করতে পারে না, এ আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি না। আজ হিন্দুস্তানে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যদিও চান না কোনো সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার করুক, কিন্তু তাঁর সরকারের পক্ষে দাঙ্গা বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, তাঁর দলবলের মধ্যে এমন লোক আছে যারা এটাকে জিয়াইয়া রাখতে চায়। তাই পণ্ডিতজি শত চেষ্টা করেও দাঙ্গা থামাতে সমর্থ হচ্ছেন না। এই একইভাবে চিয়াং কাইশেকের চীনে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর ছারখার হয়ে যেত।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১১১-১১২)

মুসলিম ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

বঙ্গবন্ধু বিভেদের রাজনীতি পছন্দ করতেন না। তিনি মানুষের ধর্মপ্রেরণাকে তুলে ধরে লিখেছেন, মানুষ যদি সত্যিকারভাবে ধর্মভাব নিয়ে চলত, তাহলে যুগ যুগ ধরে এত সংগ্রাম থাকত না। কিন্তু কিছু লোক ধর্মের মধ্যে নিজেদের স্বার্থে বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে। এসকল ব্যক্তিদের সম্পর্কে তিনি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"মানুষ যদি সত্যিকারভাবে ধর্মভাব নিয়ে চলতো তাহলে আর মানুষে মানুষে এবং রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এইভাবে যুগ যুগ ধরে সংগ্রাম হতো না। কিন্তু মানুষ নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ধর্মের অর্থ যার যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে চালাতে চেষ্টা করেছে। ধরুন রাসূলে করিম (সা) ইসলাম ধর্মকে যেভাবে রূপ দিয়েছিলেন সেইভাবে যদি ধর্ম চলতো তাহা হলে আজ আর মানুষে মানুষে এ বিরোধ হতো না। কিন্তু সেই ইসলাম ধর্মের মধ্যে কত বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সুন্নি, শিয়া, কাদিয়ানি, ইসমাইলি, আগাখানি, আবার মোহম্মদি, ওহাবি, কত রকমের বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে একই ধর্মের মধ্যে। এর অর্থ কী? আমরা দেখতে পেয়েছি

শুধু হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ধর্মের লোকেরাই একে অন্যের সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে নাই। শিয়া সুন্নি দাঙ্গার কথা আপনারা জানেন, হাজার হাজার মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করেছে। আপনারা এও জানেন, কাদিয়ানি-শিয়া-সুন্নিদের সাথে পাঞ্জাবে যে হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে তার নজির বোধ হয় ইতিহাসে বিরল। এর কারণ কী? আজ ধর্ম কোথায়? আর যারা আমাদের ধর্মের গুরু তাদের অবস্থা কী? একবার চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, আমাদের দেশে এককালে এই সকল তথাকথিত ধর্মগুরু বা পীর সাহেবরা ইংরেজি পড়া হারাম বলে আমাদের জাতির কী ভয়ানক ক্ষতি করেছে। সৈয়দ আহমদ যখন ইংরেজি পড়ার জন্য আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করলেন তখন তাঁকে এই সকল পীর সাহেবরা ফতোয়া দিল 'কাফের' বলে। জিন্নাহ সাহেব যখন পাকিস্তানের আন্দোলন শুরু করলেন তখন এই সমস্ত পীর সাহেবরা কায়েদে আজমের বিরুদ্ধে কী জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করেছিল। হাজার হাজার প্যামফ্লেট কংগ্রেসের টাকা দিয়া ছাপাইয়া দেশ বিদেশে বিলি করেছিল। ইসলামের নামে তারা কুরআন ও হাদিস দিয়া প্রমাণ করে দিতে চেষ্টা করতো যে পাকিস্তান দাবি করা আর কুরআনের খেলাফ কাজ করা একই কথা। আর একদল পীর মওলানারা বলতো এবং কেতাব কুরআন দিয়া প্রমাণ করতো যে পাকিস্তান চাওয়া জায়েয আছে।

আমার মনে আছে, যখন আমি সিলেটে গণভোটে যাই, আমার সাথে প্রায় তিনশত কর্মী ছিল। সিলেটে দেওবন্দের পাশ করা প্রায় ১৫ হাজার মওলানা আছেন। তারা প্রায় সকলে একমত হয়ে ফতোয়া দিলো যে সিলেট জেলা পাকিস্তানে যাওয়া উচিত হবে না এবং কুরআন হাদিস দিয়ে তা প্রমাণ করে দিতে চেষ্টা করলো। সেখানে ভোটাভুটি হবে। লোকে যদি ভোট দেয় পাকিস্তানের পক্ষে তবে সিলেট জেলা পাকিস্তানে আসবে, আর যদি হিন্দুস্তানের পক্ষে ভোট দেয় তবে হিন্দুস্তানে যোগদান করবে। আমরা সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কাজ শুরু হলো। হাজার হাজার মওলানা লম্বা জামা পরে কংগ্রেসের টাকা নিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন, পাকিস্তানে ভোট দেওয়া হারাম। আমরা বলতে শুরু করলাম ওরা ভাড়াটিয়া মওলানা, ওদের কথা শুনো না।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১০৮-১০৯)

সংঘাত-হানাহানি পরিহার

সমাজ ও রাষ্ট্রে অশান্তি-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ঘোর বিরোধী ছিলেন বঙ্গবন্ধু। যেকোনো মূল্যে তিনি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। এমনকি প্রয়োজনে নিজে সমূহ ক্ষতি স্বীকার করে হলেও শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন। এমনই একটি ঘটনা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"যা হোক সভার দিন সকাল সকাল আমরা উপস্থিত হলাম। যেয়ে দেখি আবার কংগ্রেসী মওলানাদের দলও এসেছে। তারা প্রস্তাব করলো যে, 'সভা করতে পারো আগে তবে বাহাস (বিতর্ক) করতে হবে। তোমরা পূর্বে বলো, আর আমরা পরে বলবো।' বাধ্য হয়ে কিলের ভয়েতে আমাদের মেনে নিতে হলো। প্রায় দশ হাজার লোক সভায় উপস্থিত হয়েছে। তারাও বললো, আচ্ছা দুই পক্ষের কথাই আমরা শুনবো। হায় খোদা! দেখি প্রায় ৮/১০ জন বিরাট বিরাট মওলানা। এক জনের নাম এক পৃষ্ঠা, আলী হজরত থেকে আরম্ভ করে অনেকদূর বলতে হয়। আমার তো দেখে প্রাণ শুকিয়ে গিয়েছে। তারা সভায় বহু কেতাব কুরআন নিয়েও এসেছে; প্রমাণ করে দেবে যে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেওয়া হারাম। ভাবি, হায় হায় সব শেষ হয়ে যাবো! আমার সাথে শুধু এক স্কুলের মৌলবী সাহেব, তিনি কিছু কুরআন হাদিস জানেন। ওদের দিকে চেয়ে তারও অবস্থা কাহিল। আর আমার সাথে ছিল করিমগঞ্জ মহকুমার গণভোট কমিটির প্রেসিডেন্ট ফোরকান আলি মুন্সী সাহেব।

আমরা বিদেশি মানুষ, আমাদের পূর্বে বলতে দেওয়া হলো। স্কুলের মৌলবি সাহেব আধঘণ্টা খানেক কুরআন হাদিস দিয়ে কিছু বোঝালেন। আর ফোরকান আলি মুন্সী সাহেব আধ ঘণ্টা কিছু বললেন। আর আমার ভাগ্যে হলো দুই ঘণ্টা। সোহরাওয়ার্দী সাহেব আমাকে মাইক্রোফোন দিয়েছিলেন, আমি মাইক্রোফোনে বক্তৃতা শুরু করলাম। পীর সাহেবরা প্রথমে দাঁড়াইয়া ফতোয়া দিলেন, মাইক্রোফোনে কথা বলা হারাম। যা হোক, আমি ওদের হারাম আর হালাল মানি কম। জানি, তা মানলে আর পাকিস্তান আসতো না। বক্তৃতা দুই ঘণ্টা দেওয়ার পরে কর্মীরা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ, কায়েদে আজম জিন্দাবাদ' শুর করলো। জনসাধারণও তাদের সাথে মিলে বলতে আরম্ভ করলো। আর যায় কোথায়? পীর সাহেবরা দাঁড়াইয়া আমাকে ও কর্মীদের মারবার জন্য হুকুম দিলো। প্রায় ২/৩ শত লোক লাঠি নিয়ে আমাকে আক্রমণ করলো। আমার সাথে কর্মীরা এসে আমার পাশে দাঁড়ালো। আমি মাথাটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, "আমাকে মেরে যদি শান্তি পান,

মারুন।" কিন্তু কতক্ষণ হৈ চৈ করে আর মারলো না, চলে গেল। এ ঘটনাটা বলা আমার এখানে উচিত কিনা জানি না, তবুও বললাম এই উদ্দেশ্যে যে, কেমন করে আমাদের দেশের একদল মওলানা টাকার লোভে কুরআন হাদীসের মিথ্যা ব্যাখ্যা করতে পারে। কেন তারা এ কাজ করে? এর অর্থ, তারা এটাকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করেছে।

কোনো কাজকর্ম করে না, মানুষকে ফাঁকি দেয়, মাদ্রাসার নামে, মসজিদের নামে, লিল্লা বোর্ডিংয়ের নামে টাকা তুলে নিজেদের ভরণপোষণ করে। চিয়াং কাইশেকের চীনে সেই দশা ছিল। কামাল আতাতুর্কের তুরস্কেরও সেই দশা ছিল।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১১০-১১১)

ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণ

বঙ্গবন্ধু তাঁর নয়াচীন সফরকালে চীনের ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। তিনি সেখানকার মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কার্যকলাপ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নয়াচীনের সমাজ ব্যবস্থায় একসময় বিভিন্ন ধর্মীয় কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে চীন থেকে সে সকল ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীভূত করা হয়েছে। নয়াচীন থেকে কীভাবে কুসংস্কার দূর করা হয়েছিল সে সম্পর্কে তিনি তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"শুধু মুসলমান সমাজের মধ্যেই এই কুসংস্কার ছিল না, চীন দেশে– বৌদ্ধ সমাজে এর চেয়ে বেশি ছিল।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১১১-১১২)

অন্যত্র বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"নয়াচীনে শুধু ইসলামিক কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনই নাই, খ্রিষ্টান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনও আছে, বৌদ্ধ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনও আছে। তারাও তাদের সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে। অষ্ট্রেলিয়ার এক ভদ্রমহিলা– যিনি খ্রিষ্টান ধর্মযাজক ছিলেন, প্রায় ৩০ বৎসর চীনে আছেন– তাঁর কাছে খ্রিষ্টানদের কুসংস্কার সম্বন্ধে গল্প শুনেছি। তিনি শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। খ্রিষ্টানদের চেয়ে বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে বেশি কুসংস্কার ছিল। আজ আর কোনো কুসংস্কার চীন দেশে নাই।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১১৪)

ঈমান-আকিদা

বঙ্গবন্ধুর ঈমান-আকিদা নিয়ে এ দেশের কতিপয় কুচক্রী মহল রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলের জন্য যুগে যুগে গভীর ষড়যন্ত্রে নিমজ্জিত ছিল। তাদের অপবাদের জবাব প্রদানের নিমিত্তে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

> "আমাদের দেশে প্রোপাগাণ্ডা হয়েছে, নয়াচীনে ধর্ম-কর্ম করতে দেওয়া হয় না। এটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি। আর যদি আমি নয়াচীনে দেখতাম ধর্ম পালন করতে দেওয়া হয় না, তবে সমস্ত দুনিয়ায় এর বিরুদ্ধে আমি প্রোপাগাণ্ডা করতাম। কারণ, আমি ব্যক্তিগতভাবে ধর্মে বিশ্বাসী এবং নিজে একজন মুসলমান বলে গর্ব অনুভব করি।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১১২)

অন্যত্র বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

> "আমাকে মুসলিম লীগওয়ালারা কম্যুনিস্ট বলতে ছাড়ে না; যদিও কম্যুনিস্ট আদর্শের সাথে আমার কোনো সম্বন্ধ নাই। আমি আলাদা পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি– তবে ম্যানিফেস্টো আছে, গঠনতন্ত্র আছে, তার নেতা জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী। শহীদ সাহেব কম্যুনিস্ট বিরোধী এবং মওলানা ভাসানী ইসলামের সত্যিকারের খাদেম। তাই ও কথা উঠে না, কিন্তু আমাদের দেশের একদল লোক আছে ভালো কথা বললেই কম্যুনিস্ট বলে চীৎকার শুরু করে। তাদের জন্যই আজ লোকের মধ্যে দিন দিন ধারণা হচ্ছে কম্যুনিস্টরাই বোধ হয় ভালো কথা কয়। নয়াচীনে কম্যুনিস্ট নীতি বলে কোনো নীতি দেখলাম না। দেশের ও জনগণের যাতে মঙ্গল হয় তাই তাদের কাম্য এবং সেই কাজই তারা করে।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১১৫-১১৬)

নয়াচীনে মুসলিম সামাজিক অবস্থা

বঙ্গবন্ধু তৎকালীন নয়াচীনের মুসলিম সামাজিক অবস্থাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। নয়াচীনে মুসলিমদের আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত 'অল চায়না ইসলামিক কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের তিনি সুনাম করেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাজ ছিল সামাজিক বিভিন্ন কুসংস্কার দূর করার পাশাপাশি মসজিদ-মাদ্রাসাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। ফলে ধর্মের নামে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ব্যবসা করতে পারত না। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

> "যতদূর খবর নিয়া জানলাম, নয়াচীনে একটা প্রতিষ্ঠান আছে যার নাম 'অল চায়না ইসলামিক কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন'। এই প্রতিষ্ঠান থেকে পিকিং সরকারকে সাহায্য করা হয়। আর মুসলমানরা অর্থ দিয়া একে বাঁচাইয়া রাখে। এদের কাজ, ইসলামের নামে যে-সব কুসংস্কার

চালু হয়েছে তা মুছে ফেলে দেওয়া, যত মসজিদ আছে তার হিসাব নিয়া ইমাম নিযুক্ত করা। তাদের মাসে মাসে বেতন দেওয়া, আর অনেক ইমামকে জমি বা অন্য কাজ দেওয়া হয়েছে যাতে তাদের পরের দানের ওপর নির্ভর করতে না হয়। এরাই বড় বড় মাদ্রাসা করে, সেখান থেকে পাশ করলে 'মওলানা' বা 'মৌলবি' লেখা যায়। অন্য কোথাও থেকে পাশ করলে 'মওলানা' লেখার ক্ষমতা নাই এবং এই কমিটিও তেমন কাউকে মওলানা হিসেবে গ্রহণ করবে না। পাশ করার পরে আবার একটা পরীক্ষা দিতে হয়। একটা বোর্ড আছে, বোর্ডের পরীক্ষায় পাশ করলে তাদের চাকরি দেওয়া হয়। ইচ্ছামতো মাদ্রাসা করে ব্যবসা করা যায় না। এই কমিটি থেকে অনুমতি নিতে হবে। ঐ কমিটি অনুমতি দিলেই সরকারও অনুমতি দিবে। যদি কোথাও মসজিদ ভেঙে যায় বা মেরামত করতে হয় তবে কমিটি তা করবে জনগণের সাহায্য নিয়ে। কেন্দ্রীয় কমিটির ব্রাঞ্চ হিসেবে প্রাদেশিক, জেলা, মহকুমা কমিটিও আছে। পীর মুরিদির ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১১৩)

বাংলাদেশের মুসলিম সামাজিক অবস্থা

নয়াচীনের মুসলিম সামাজিক অবস্থা বর্ণনার পাশাপাশি বাংলাদেশের মুসলিম সামাজিক অবস্থাও বঙ্গবন্ধুর লিখনীতে ফুটে উঠেছে। যেখানে তিনি ধর্মের নামে যে সকল অনৈতিক ও অসৎ কার্যাবলি সম্পাদিত হতো তার সমালোচনা করেছেন। সর্বোপরি নয়াচীন ও বাংলাদেশের মুসলিম সামাজিক অবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা পেশ করেছেন। এরূপ তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল, এর মাধ্যমে যেন এদেশের মুসলিম সমাজ সচেতন হয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে যেন সকল প্রকার কুসংস্কার দূরীভূত হয়। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"আমাদের দেশে যদি যক্ষ্মার ব্যারাম হয় তবে পীর সাহেব এক টাকা সোয়া পাঁচ আনা পয়সা নিয়া তাবিজ দিয়া বলে, 'ভালো হয়ে যাবা'। বেচারা বিশ্বাস করে পড়ে থাকে। একদিন ভুগতে ভুগতে মারা যায়, আর কিছু ব্যারাম বিলিয়ে রেখে যায়, হয় স্ত্রীর যক্ষ্মা হবে, না হয় ছেলেমেয়েদের হবে। এইভাবে রোগের বিস্তার ঘটে। তাই তাবিজ-কবজ ফুঁ-ফাঁ বন্ধ হয়ে গেছে নয়াচীনে। তাতে ইসলামের কোনে ক্ষতি হয় নাই বরং উপকার হয়েছে। বসে বসে টাকা নেওয়া আর চারটা করে বিবাহ করা নয়াচীনে এখন আর চলে না, যা আমাদের দেশে সচরাচর চলে থাকে। আবার কেউ ৬০ বৎসর বয়সে ১৪ বৎসরের মেয়ে বিবাহ

করে বসে থাকে। এমন অনেক গল্প চীন দেশে ছিল, আমাদের দেশেও আছে যে, পীর সাহেবদের মুরিদরা মেয়ে দান করে। ৬০ বৎসরের পীর সাহেব ১২ বৎসরের মেয়েকে বিবাহ করিয়া মুরিদের দান গ্রহণ করেন। নয়াচীনের ইসলামিক কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন এই সমস্ত অন্যায় কাজ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১১৩-১১৪)

আলেমের প্রকৃতি ও স্বরূপ

পাকিস্তানি আমল থেকেই এদেশে ইসলাম প্রচার-প্রসারে আলেমগণ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ফলে সাধারণ মানুষের নিকট আলেমগণ বিশেষ সম্মানের অধিকারী। কিন্তু আলেমের সম্মানে ভূষিত হওয়ার জন্য কতিপয় ভণ্ড-প্রতারক ব্যক্তি আলেমের রূপ ধারণ করে মানুষকে যুগ যুগ ধরে ধোঁকা দিয়ে আসছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর লিখনীতে উক্ত দু'রকম আলেমের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

"সাংহাই জামে মসজিদের ইমাম সাহেব আমাদের অনেক গল্প বলেছিলেন। মনে হলো এঁদের মতো ইমাম হলে দেশের যথেষ্ট উপকার হতো। মাঝে মাঝে আমাদের মনে হয় হায়! ৪ বৎসরে যে কুসংস্কার নয়াচীন ধ্বংস করেছে তা করতে আমাদের কত সময় লাগবে? মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বেঁচে থাকলে অন্ততপক্ষে এই কাজটা হতো। তিনি এ সমস্ত ধোঁকাবাজ, পরের টাকায় নির্ভরশীল মওলানা দেখতে পারতেন না। আজ আমাদের দেশেও ২/১ জন শিক্ষিত মওলানা আছেন, যাঁরা এই সমস্ত কুসংস্কার দূর করতে চান।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১১৪)

বেঈমানদের পরিণতি

ধর্মের নামে কোনরূপ অপরাজনীতিকে বঙ্গবন্ধু পছন্দ করতেন না। তিনি সর্বদা এর বিরোধিতা করেছেন। এমনকি ইসলামের লেবাসধারী অসাধু ব্যক্তিদেরকে তিনি বেঈমান বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর এসকল ব্যক্তি তাদের অপকর্মের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক ক্ষমা লাভ করবে না বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"ধর্মের দোহাই দিয়ে সেখানে আজ রাজনীতি চলে না, যা চলছে আজও আমাদের দেশে। অনেক নেতাকে আমি জানি, যারা মুসলিম লীগের সদস্য– যাদের সাথে আমি বহুদিন রাজনীতি করেছি– তারা ইসলামের যে কয়েকটা কাজ করা নিষেধ আছে, তার প্রত্যেকটা করে; আবার ইলেকশনে দাঁড়াইয়া বড় বড় পীর মওলানাদের হাজির করে তাদের কাছ থেকে ফতোয়া নেয় টাকা দিয়া। বক্তৃতায় ইসলামের কথা বলে

বেহুঁশ হয়ে পড়ে। আমার যতদূর ইসলাম সম্বন্ধে জানা আছে তাতে আল্লাহ্ সকলকে ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু এই বেঈমানদের কোনোদিন ক্ষমা করবে না।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১১৪-১১৫)

ধর্মীয় অপরাজনীতি

অত্র গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় বারবার প্রমাণিত করা হয়েছে যে, ধর্মের নামে অপরাজনীতি বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে ছিল না। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু তাঁর চীন সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

"এই রাজনৈতিক নেতারাই নিজেদের স্বার্থের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে– নিজেদের নেতৃত্ব রক্ষা করার জন্য। জনসাধারণকে ধর্মের নামে ধোঁকা দিয়ে তাদের শাসন ও শোষণ করতে চায়। এরাই দুনিয়ায় ধর্মকে মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে ধর্মের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে ও করছে। ধর্মের ভিতর যা আছে তা মানুষ সত্যিকারভাবে বুঝতে পারলে, আর তা পালন করলে দেশে শোষণ, অত্যাচার, অবিচার থাকত কি না সন্দেহ! নয়াচীনে আজ আর কেহ রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহার করতে পারে না। ব্যক্তিগতভাবে যার ইচ্ছা ধর্মকর্ম করতে পারে, কেহ তাকে বাধা দিতে পারবে না। আর কেহ ধর্ম পালন না করলেও কেহ জোর করে করাতে পারবে না। দুইটাই নয়াচীনে আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১১৫)

নয়াচীন সরকারের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি

ধর্মীয় বিভেদ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত। ধর্মের নামে বিভেদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কোন সুস্থ মানুষের জন্য শোভনীয় নয়। কেননা ধর্মের নামে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সাম্প্রদায়িক কলহ কেবল শান্তির পরিবর্তে অশান্তি আনয়ন করে। এছাড়া রাষ্ট্রের উন্নয়নেও তা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। এজন্যই নয়াচীন সরকার রাষ্ট্রের উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতাকে নির্মূল করেছিল। ফলে তাদের দেশে ধর্মের ভিত্তিতে কেউ কোন সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারত না। কেবল যোগ্যতা, দক্ষতার ভিত্তিতে সুযোগ-সুবিধা লাভ করা যেত। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"সম্প্রদায় হিসাবে সেখানে রাষ্ট্রের কোনো সুযোগ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধরা শতকরা ৮০ জন বলে শতকরা ৮০টা চাকুরি তাদের দিবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা সেখানে নেই। যদি মুসলমানরা সংখ্যায় নগণ্য হয়েও শিক্ষিত বেশি হয় চাকুরি তাহারাই বেশি পাবে। যে যে কাজে সক্ষম সে সেই কাজ পাবে, খ্রিষ্টান বলে অথবা মুসলমান বলে তাকে বাদ দেওয়া চলবে না। অনেক মুসলমান আছে যারা অনেক বড়

বড় সরকারি চাকুরি অধিকার করে আছে। অনেক প্রদেশের গভর্নর মুসলমান। সৈন্যবাহিনীতে অনেক বড় বড় পদ মুসলমানরা অধিকার করে আছে। নয়াচীনের সৈন্যবাহিনীতে সংখ্যানুপাতে মুসলমান অনেক বেশি। যে অঞ্চলে মুসলমানরা বাস করে তারা যোদ্ধা নামে পরিচিত ও খুব সাহসী। নয়াচীন সকলকেই মানুষ হিসাবে বিচার করে; কে কোন ধর্মের তা দিয়ে বিচার হয় না। তাই নয়াচীন সরকার সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণের সমর্থন পেয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে কোনো সরকার এত ভালো কাজ করতে পারে নাই। যারাই নয়াচীনে গেছে তাহারাই এদের প্রশংসা করেছে, শুধু আমি একা হতভাগাই মুগ্ধ হই নাই।" (*আমার দেখা নয়াচীন*, পৃ. ১১৫)

উপসংহার

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন যেমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তেমনি তাঁর লিখিত 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থটিও পাঠক সমাজে বেশ সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। কেননা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত জীবনের 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থটি এমনই অসঙ্কোচ সত্যের এক অনন্য নিদর্শন, যা বাঙালি জাতির জন্য একটি অনিঃশেষ আলোকবর্তিকা স্বরূপ। এতে ধর্মীয় ও নৈতিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াদি এত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, যেকোনো পাঠক তা থেকে খুব সহজেই শিক্ষা লাভ করে নিজ জীবনে প্রয়োগ করে সফলতা লাভ করতে পারবেন। তাই বঙ্গবন্ধুর নয়াচীন ভ্রমণেতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থটি সর্বস্তরের পাঠকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটি পাঠে অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর আদর্শ সম্পর্কে ধারণা লাভ করত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন করে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠতে পারে। আর এভাবেই বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব বলে আমাদের বিশ্বাস।♦

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান : প্রফেসর ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫। ই-মেইল: mahbub.ru2011@gmail.com
মো. আশরাফুল ইসলাম : পিএইচডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫। ই-মেইল: ashrafulislam0609@gmail.com

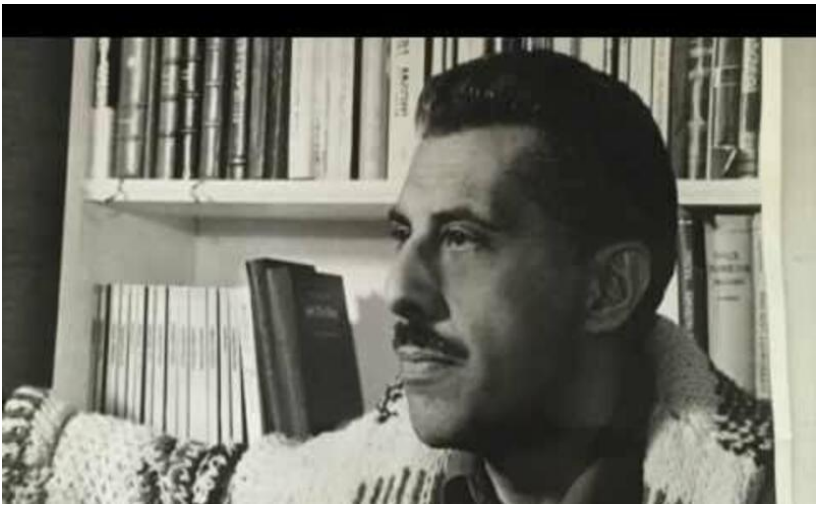

সুফি লেখক ইদ্রিস শাহ

১৬ জুন ১৯২৪-২৩ নভেম্বর ১৯৯৬

কাজী আখতারউদ্দিন

সুফিবাদের শিক্ষক ও লেখক ইদ্রিস শাহ বিশ শতকের একজন অগ্রগণ্য চিন্তাবিদ ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ছত্রিশটি বই লিখেছেন। তাঁর রচনার বিষয় ছিল মনস্তত্ব ও আধ্যাত্মিকতাবাদ থেকে শুরু করে ভ্রমণ, কৃষ্টি এবং সভ্যতা।

একটি আফগান অভিজাত পরিবারের সন্তান ইদ্রিস শাহের জন্ম ভারতে হলেও তিনি মূলত ইংল্যান্ডে বড় হন। শুরুতে তিনি জাদুবিদ্যা নিয়ে লেখালেখি করতেন। তবে ১৯৬০ সালে তিনি অক্টাগন প্রেস নামে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। এই প্রকাশনা থেকে সুফি দর্শনের বিভিন্ন পুস্তকের অনুবাদ ছাড়াও, তাঁর নিজের রচনাও প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত *দ্য সুফি* নামে যুগান্তকারী পুস্তকটি

১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৬৫ সালে ইদ্রিস শাহ *ইন্সিটিটিউট ফর কালচারেল রিসার্চ* নামে লন্ডনভিত্তিক একটি শিক্ষামূলক দাতব্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটিতে মানুষের আচার আচরণ ও কৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করা হতো। একইরকম আরেকটি প্রতিষ্ঠান *দা ইন্সিটিটিউট ফর দা স্টাডি অব হিউম্যান নলেজ* যুক্তরাষ্ট্রেও প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক রবার্ট অর্নস্টেইনকে এর পরিচালক নিযুক্ত করা হয়।

ইদ্রিস শাহ তাঁর রচনায় তুলে ধরেন যে, সুফিবাদ বহু আগে থেকেই একটি বিশ্বজনীন জ্ঞান হিসেবে ছিল। তিনি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, সুফিবাদ নিশ্চল কোন বিষয় ছিল না। বরং প্রচলিত বা সাম্প্রতিক সময়, স্থান ও পাত্রের সাথে সুফিবাদ নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। চিরাচরিত শিক্ষামূলক এবং উপদেশমূলক গল্পের উপর তিনি জোর দেন। এসব রচনায় বিভিন্ন ধরনের অর্থ নিহিত থাকে, যা পাঠকের অন্তর্দৃষ্টি জাগিয়ে তোলে। মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প সংকলনের জন্য তিনি খ্যাতি লাভ করেন।

অনেক সময় প্রাচ্যবিদরা তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। বিশেষত ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের একটি নতুন অনুবাদে তাঁর ভূমিকা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। তাঁর বড় ভাই ওমর আলি শাহ এবং বন্ধু রবার্ট গ্রেভস এই অনুবাদটি প্রকাশ করেন। তবে তাঁর সপক্ষে যারা দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের মধ্যে নোবেল বিজয়ী ঔপন্যাসিক ডোরিস লেসিং এর নাম উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য জগতে ইদ্রিস শাহ সুফিবাদের একজন মুখপাত্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ভিজিটিং প্রফেসার হিসেবে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, যে কোন মানুষ সুফিবাদকে একটি আধ্যাত্মিক জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করতে পারে এবং এর জন্য নির্দিষ্ট কোন ধর্মাবলম্বী হওয়া দরকার নেই, এই বিষয়টির উপর তাঁর কাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পরিবার ও শৈশব

ইদ্রিস শাহের জন্ম ভারতের শিমলায়। তাঁর বাবা সর্দার ইকবাল আলি শাহ ছিলেন আফগান বংশোদ্ভূত একজন ভারতীয় লেখক ও কূটনীতিবিদ। তাঁর মা সায়রা এলিজাবেথ লুউজা শাহ স্কটল্যান্ডের অধিবাসী ছিলেন। তাদের পৈত্রিক নিবাস ছিল কাবুলের পাগমান গার্ডেনে। তাঁর পিতামহ সৈয়দ আমজাদ আলি ছিলেন উত্তর প্রদেশের সরধানার নবাব। তাদের পূর্ব পুরুষ জান-ফিশান খান ব্রিটিশ সরকারকে সহায়তা করায়, ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নবাব উপাধি দেন। তারপর পুরুষানুক্রমে তারা এই উপাধিটি ব্যবহার করে আসছেন।

বিশিষ্ট লেখক ও চিন্তাবিদ সর্দার ইকবাল শাহের একজন সন্তান হিসেবে ইদ্রিস শাহ এমন একটি পরিবারে বড় হন, যেখানে সবসময় চিরায়ত ইসলামিক সাহিত্যের চর্চা হতো।

ইদ্রিস শাহ লন্ডনেই বড় হন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এল. এফ. রাশব্রুক উইলিয়ামের (১৮৯০-১৯৭৮) মতে ইদ্রিস শাহ ছোটবেলা থেকেই তাঁর বাবার সাথে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করতেন। ইদ্রিস শাহের বাবা ইকবাল আলি শাহ সুফিবাদের কাজের অংশ হিসেবেই বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করতেন, ফলে ইদ্রিস শাহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়ক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাত লাভের সুযোগ পান।

এ ধরনের পরিবেশে বড় হওয়ার কারণে ইদ্রিস শাহের মতো একজন বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ অচিরেই সত্যিকার আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি, উদার মনোভাব অর্জন করতে সক্ষম হন। এছাড়া এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও স্থানের সাথে পরিচিত হন, যা একজন অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদও সহজে পারেন না। তবে কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনে তিনি তেমন আগ্রহ পাননি।

১৯৭১ সালে বিবিসির সাথে একটি সাক্ষাতকারে শৈশব স্মৃতি তুলে ধরার সময় তিনি জানান যে, একটু ব্যতিক্রমী পরিবেশে তিনি বড় হয়েছেন। তাঁর বাবা এবং অন্যরা সবসময় তাকে বিভিন্ন ধরনের মানুষ এবং অভিজ্ঞতার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন, যাতে তিনি সবদিক দিয়ে নিখুঁত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষ হিসেবে বড় হয়ে উঠেন। এই বিষয়টিকে ইদ্রিস শাহ 'সুফি তরিকায়' শিক্ষা লাভের একটি পন্থা হিসেবে বর্ণনা করেন।

১৯৫৮ সালে তিনি ভারতীয় কবি ফ্রিদুন কবরাজির কন্যা পার্সি সিনথিয়া (কাসফি) কাবরাজিকে বিয়ে করেন। এই দম্পতির দুই কন্যা-সায়রা এবং সাফিয়া এবং তাহির নামে একটি পুত্রসন্তান ছিল।

১৯৫০ সালের শেষ দিকে প্রাক খ্রিষ্টান ধর্মবিশ্বাসী এক গোষ্ঠির সাথে ইদ্রিস শাহ পরিচিত হন। তখনকার দিনে উত্তর লন্ডনের সুইস কটেজের কসমো রেস্তোরায় একটি টেবিলে তিনি লোকজনকে সুফিবাদ সম্পর্কে বলতেন।

১৯৬১ সালের জানুয়ারী ইদ্রিস শাহ স্পেনের ম্যালোরকা ভ্রমণ করেন এবং সেখানে তাঁর সাথে ইংরেজ কবি রবার্ট গ্রেভসের পরিচয় হয়। দুজনের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় এবং অচিরেই উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। ইদ্রিস শাহের লেখালেখির বিষয়ে রবার্ট গ্রেভস আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তিনি ইদ্রিস শাহকে সুফি দর্শন সম্পর্কে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশ করতে উৎসাহিত করেন, যাতে পাশ্চাত্যের পাঠকরা সহজেই তা পাঠ করতে পারেন। এ

থেকেই *দা সুফিস* পুস্তকটি প্রকাশিত হল। বিভিন্ন জনের কাছ থেকে টাকা ধার করে ইদ্রিস শাহ এই বইটি প্রকাশ করেন।

১৯৬৪ সালে ডাবলডে প্রকাশনা সংস্থা থেকে *দা সুফি* বইটি প্রকাশিত হয়। রবার্ট গ্রেভস এর একটি দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করেন। এই বইটিতে পশ্চিমা সভ্যতার বিকাশে সুফিবাদের প্রভাব তুলে ধরা হয়। এতে সপ্তম শতক থেকে ধারাবাহিকভাবে মধ্যযুগীয় ইংরেজ দার্শনিক রজার বেকন (আনু. ১২১৯-১২৯২), স্পেনিশ ধর্মযাজক জন অব দা ব্রস (১৫৪২-১৫৯১), স্পেনিয় দার্শনিক ও ধর্মযাজক রেমন্ড লালি (আনু১২৩২-১৩১৫), ইংরেজ কবি ও লেখক চসার (আনু. ১৩৪০-১৪০০) এবং অন্যদের কাজের বিবরণ তুলে ধরা হয়। বইটি একটি ক্লাসিকে পরিণত হয়। ১৯৬৫ সালে ইদ্রিস শাহ *দা সোসাইটি ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফান্ডামেন্টাল আইডিয়াস* (SUFI) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। পরবর্তীতে এর নামকরণ করা হয় *ইন্সটিটিউট ফর কালচারেল রিসার্চ* (ICR)। এটা ছিল একটি শিক্ষামূলক দাতব্যকেন্দ্র, যার লক্ষ্য ছিল 'মানুষের চিন্তাচেতনা, স্বভাব এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির সকল বিষয় নিয়ে শিক্ষা, গবেষণা, তর্কবিতর্ক' অনুপ্রাণিত করা। এছাড়া তিনি *সোসাইটি ফর সুফি স্টাডিস* (SSS) নামেও একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন।

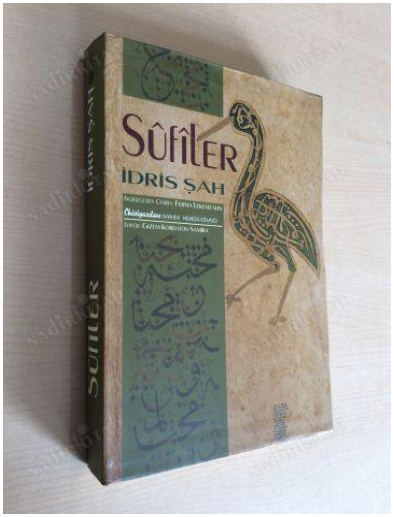

তিনি লন্ডনের ল্যাংটন গ্রিনে ল্যাংটন হাউস নামে বয় স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের কাছ থেকে একটি এস্টেট কিনে নেন। এই স্থানটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবি, দার্শনিক এবং রাষ্ট্রনেতাদের একটি মিলন কেন্দ্র হয়ে উঠে। এরা সেখানে মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনা করতেন।

সেসময়ে এই স্থানটি সাহিত্যচর্চারও একটি কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। *ইন্সটিটিউট ফর কালচারেল রিসার্চ*-এ মাঝে মাঝে সভা ও বিভিন্ন বক্তৃতা হতো। এছাড়া এখানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পন্ডিতদের ফেলোশিপ প্রদান করা হতো। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল স্যার জন ব্যাগট গ্লাব পাশা (১৮৯৭-১৯৮৬), অধ্যাপক আকিলা কায়ানি/ বেগম (১৯২১-২০১২), স্নায়বিক মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক রিচার্ড ল্যাংটন গ্রেগরি (১৯২৩-২০১০) এবং লেখক, কূটনীতিবিদ এবং ইউনিভার্সিটি অব রিডিং-এর ইউরোপিয়ান স্টাডি বিভাগের প্রধান রবার্ট সেসিল (১৯১৩-১৯৯৪)। ইনি ১৯৭০ সালের প্রথম দিকে এই ইন্সিটিউটের চেয়ারম্যান হন।

ইদ্রিস শাহ ইতালির ক্লাব অব রোমের একজন সদস্য ও সমর্থক ছিলেন। এই ক্লাবের সদস্য ব্রিটিশ বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার কিং (১৯০৯-২০০৭) ইন্সটিটিউট ফর কালচারেল রিসার্চ-এ (ICR) বক্তৃতা দেন। আরো যারা এর অতিথি হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ইংরেজ কবি টেড হাফ (১৯৩০-১৯৯৮), আমেরিকান লেখক ডেভিড স্যালিংগার (১৯১৯-২০১০), ইংরেজ লেখক এলান সিলিটো (১৯২৮-২০১০), ২০০৭ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ঔপন্যাসিক ডরিস লেসিং (১৯১৯-২০১৩) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া প্রাণীবিদ ডেসমন্ড মরিস (১৯২৮-) এবং আমেরিকান লেখক ও মনস্তত্ত্ববিদ রবার্ট অর্নস্টেইন (১৯৪২-২০১৮) নিয়মিত এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন। বাড়িটি মধ্যপ্রাচ্যের রীতিতে সাজানো ছিল।

পরবর্তী বছরগুলোতে ইদ্রিস শাহ অক্টাগেন প্রেস থেকে অসংখ্য সুফি ক্লাসিক বইয়ের অনুবাদ পুনঃপ্রকাশ করেন। তিনি সারা জীবন হাজার হাজার সুফি দর্শনের ধ্রুপদি সাহিত্য সংগ্রহ, অনুবাদ এবং রচনার কাজে আত্মনিবেদিত ছিলেন। এইসব গল্প তিনি তার বই ও বক্তৃতার মাধ্যমে পশ্চিমা জগতের পাঠকসাধারণের কাছে পৌঁছে দেন। অনেকে এগুলোকে, 'ব্যবহারিক দর্শন বলতেন। এতে শত শত বছরের সুফি ও ইসলামি চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে, যার লক্ষ্য ছিল মানব মনের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন। ইদ্রিস শাহের কয়েকটি পুস্তকে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং সাথে ছিল রিচার্ড উইলিয়ামের আঁকা ছবি। 'নির্বোধ জ্ঞানী' হিসেবে তুলে ধরা মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্পগুলো ইতিপূর্বে মুসলিম লোককাহিনীর অংশ হিসেবে বিবেচিত হলেও, ইদ্রিস শাহ এগুলোকে সুফি উপমা বা নীতিগল্প হিসেবে তুলে ধরেন। তাঁর বইগুলো প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মাঝে একটি সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছে।

ড্রিমওয়াকার নামে ইদ্রিস শাহের টেলিভিশন ডকুমেন্টারিতে নাসিরুদ্দিনকে উপস্থাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি ১৯৭০ সালে বিবিসিতে প্রচারিত হয়। এই

অনুষ্ঠানে কানাডিয়-ব্রিটিশ কার্টুন চিত্র নির্মাতা রিচার্ড উইলিয়ামকে তার অসমাপ্ত এমিনেমেটেড ফিল্ম সম্পর্কে এবং বিজ্ঞানী জন কার্মিশকে নাসিরুদ্দিনের গল্পগুলো র‍্যান্ড কর্পোরেশন থিংক ট্যাংকে আলোচনা করার বিষয়ে সাক্ষাতকার নেওয়া হয়। এছাড়া কৌতুক অভিনেতা মার্টি ফিল্ডম্যান মানব জীবনে রসবোধ ও আচরণবিধির ভূমিকা নিয়ে ইদ্রিস শাহের সাথে আলোচনা করেন। সবশেষে ইদ্রিস শাহ গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে, 'মনস্তাত্বিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে' মনুষ্যজাতি নিজ বিবর্তনেই আরো সামনের দিকে এগোতে পারে। তবে 'অবিরাম বেড়ে চলা হতাশাবোধ বিবর্তনকে এই ধরনের সামনে এগিয়ে চলায় বাধা প্রদান করে. . . . মানুষ ঘুমিয়ে রয়েছে- জেগে উঠার আগে কী তাকে মারা যেতে হবে?'

ইদ্রিস শাহ যুক্তরাষ্ট্রেও সুফি স্টাডি গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন। চিলির সাইকিয়াট্রিস্ট কলডিও নারানজো সুফিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং 'ইদ্রিস শাহের নির্দেশনায় তিনি এই গ্রুপের একজন সদস্য হন।' রবার্ট অর্নস্টেইনের সাথে তিনি *অন দা সাইকোলজি অব মেডিটেশন* (১৯৭১) নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। উভয়েই ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। অক্টাগেন প্রেস থেকে ইদ্রিস শাহের যে বইগুলো প্রকাশিত হতো, অর্নস্টেইন যুক্তরাষ্ট্রে তার একমাত্র পরিবেশক ছিলেন।

ইদ্রিস শাহের আরেক সহযোগী বিজ্ঞানী ও প্রফেসর লিওনার্ড লিউইন একটি সুফি স্টাডি গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইউনিভার্সিটি অব কলোরাডোতে টেলিকমিউনিকেশন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। *দা ডিফিউজন অব সুফি স্টাডি ইন দা ওয়েস্ট* নামে ইদ্রিস শাহের বিভিন্ন রচনার একটি সংকলনেরও তিনি সম্পাদনা করেন ।

দুই দশকে ইদ্রিস শাহ চব্বিশটির বেশি বই রচনা করেন, এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো ছিল চিরায়ত সুফি উৎস বিষয়ে। তাঁর রচনা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়, মূলত পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবী মহলে এর আবেদন অধিক ছিল। সুফি শিক্ষাকে সমসাময়িক মনস্তত্বের ভাষায় অনুবাদ করে তিনি এই বইগুলো সাধারণের পাঠযোগ্য করে তুলেন। সুফি জ্ঞানের বিষয়ে উপকথাগুলো বিভিন্ন উপাখ্যান ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, ইউনিভার্সিটি অব জেনেভা, দা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিট অব লা প্লাটাসহ বিভিন্ন ইংলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। সাহিত্য ও শিক্ষামূলক কাজ করার পরও তিনি এছাড়া টেক্সটাইল, সিরামিক ও ইলেক্ট্রনিক কোম্পানি চালু করেন। বেশ কয়েকবার আফগানিস্তান সফর করে

সেখানে ত্রাণ কাজে অংশ নেন। পরবর্তীতে সেখানকার অভিজ্ঞতা নিয়ে সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের উপর *কারাকুশ* নামে একটি উপন্যাস রচনা করেন।

১৯৮৭ সালে আফগানিস্তানে শেষবারের সফরের পর তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসক তাকে সতর্ক করেন যে, তার হৃদযন্ত্র কেবল আটশতাংশ কাজ করছে এবং তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। তা সত্ত্বেও পরবর্তী নয়বছর তিনি কাজ করে যান এবং আরো বই প্রকাশ করেন।

১৯৯৬ সালে ২৩ নভেম্বর ইদ্রিস শাহ লন্ডনে মারা যান। তখন তার বয়স ছিল ৭২ বছর। মৃত্যুর সময় ইদ্রিস শাহের বই বিভিন্ন ভাষায় বিশ্বব্যাপী দেড় কোটি কপির উপর বিক্রি হয়। এছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তার বইয়ের রিভিউ প্রকাশিত হয়।

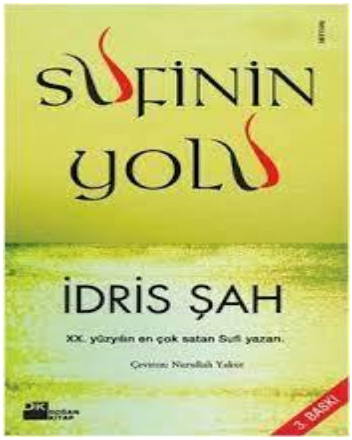

১৯৫৬ সালে ইদ্রিস শাহ তাঁর প্রথম বই *অরিয়েন্টাল ম্যাজিক* বইটি প্রকাশ করেন। এর পরের বছর ১৯৫৭ সালে তিনি *দ্যা সিক্রেট লোর অব ম্যাজিক: বুক অব দা সরসারার* প্রকাশ করেন। এই দুটি বই প্রকাশনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইদ্রিস শাহের বাবা ১৯৬৯ সালে বলেন যে, এই অর্থহীন বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু মানুষ যাতে এতে বিশ্বাস স্থাপন না করে, সেজন্য তিনি এবং তাঁর ছেলে জাদুবিদ্যা ও অতিলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত বিষয়ে বই প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন আমার ছেলে কয়েক বছর বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করার এই বিষয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বই রচনা করেছে।

এর পর তিনি *ডেস্টিনেশন মক্কা* (১৯৫৭) নামে একটি ভ্রমণকাহিনী প্রকাশ করেন। ইংরেজ লেখক ও ঐতিহাসিক স্যার ডেভিড এটেনবরো টেলিভিশনে এই বইটির কথা তুলে ধরেন। উভয় পুস্তকেরই কিছু অংশে সুফিবাদ বিষয়ে বলা হয়েছে।

ইদ্রিস শাহ বলেন সুফি দর্শন হচ্ছে এক ধরনের জ্ঞান, যা নিরন্তর চলে আসছে। তিনি বলেন, সুফিবাদ সবসময় জাগ্রত ছিল, এটা কখন স্থির ছিল না। এই জ্ঞান স্থান-কাল-পাত্রের সাথে সবসময় অভিযোজিত হয়ে আসছে।

তিনি ১৩ শতকের বিখ্যাত আরব বেদুইন সুন্নি মুসলিম দরবেশ আহমাদ আল-বাদাউই এর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন যে, 'সুফি শিক্ষালয়গুলো ঢেউ এর মতো, যা পাথরের উপর আছড়ে পড়ে: একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রুপে সাগর থেকে আসে।'

প্রাচ্যবিদরা সুফিবাদ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক সময় বলেন যে, সুফিবাদের ঐতিহাসিক রুপ ও পদ্ধতি একাডেমিক বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে গবেষণা করে সুফিবাদকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার মতো যথেষ্ট ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে ইদ্রিস শাহ তাদের এই ধারণাটি বাতিল করেন। প্রকৃতপক্ষে এর প্রথাগত ধারণা নিয়ে আচ্ছন্ন থাকলে বরং এটি একটি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তিনি বিষয়টি এইভাবে তাঁর একটি বইয়ে ব্যাখ্যা করেন: 'একজন মানুষকে যদি অনেকগুলো উটের হাড় দেখানো হয় বা বার বার তাকে এগুলো দেখান, তবে যখন সে একটা জীবন্ত উট দেখবে তখন সে এটা কী, তা চিনতে পারবে না।'

দীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি উর্দু, আরবী ও ফার্সি ভাষার রচনা পড়েছেন। প্রাচ্যের সাহিত্য ভান্ডার ও বাচিক সুফি ঐতিহ্যের বিশাল সমুদ্রের সৈকতে তন্ন তন্ন করে খুঁজে তিনি সুন্দর সুন্দর গল্প, বিস্ময় ও সম্ভ্রম উদ্রেককর কবিতা, এবং রসালো ও বিদগ্ধ নীতিবচন আবিষ্কার করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প, যা তিনি পাশ্চাত্য জগতে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

বহু বিখ্যাত লেখক ও শিক্ষাবিদ ইদ্রিস শাহের রচনায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। কবি রবার্ট গ্রেভস *দা সুফি* পুস্তকের ভূমিকা রচনা করেন। টেড হাফস্ এই বইটিকে একটি অনন্য সৃষ্টি বলেছেন।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ঔপন্যাসিক ডরিস লেসিং, ইদ্রিস শাহের সাহিত্য সম্ভার সম্পর্কে বলেন যে, 'আমাদের সময়কালে এটি এমন একটি বিস্ময়কর বিষয়, যা আর কখনও ঘটেনি।'

সমাজের সবধরনের মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করলেও, ইদ্রিস শাহ একজন গুরু হতে চাননি। লেখক জেসন ওয়েবস্টার *দা গার্ডিয়ান* পত্রিকায় একটি প্রতিবেদনে জানান যে, 'ইদ্রিস শাহ রুমির বাক্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন, "আমার বাইরের চেহারার দিকে না তাকিয়ে, হাতে যা আছে তা গ্রহণ করুন।"'

১৯৭১ সালে বিবিসির সাথে একটি সাক্ষাতকারে ইদ্রিস শাহ বলেন যে, 'সুফি দর্শনের সেই বিষয়গুলো আমি পাশ্চাত্যে তুলে ধরতে বা প্রচার করতে চাই, যা এই সময়ে তাদের কাজে লাগে। লোকজন আমাকে জিজ্ঞেস করে,

আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্যবাহী বা সনাতন পদ্ধতি কেন আমি অনুসরণ করছি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যারা আমাকে খুঁজে বেড়ায়, তাদের বেলায় এর উত্তর হচ্ছে যে, একই কারণে আপনি গাড়িতে চড়ে আমার বাড়ি এসেছেন, উটের পিঠে চড়ে নয়। প্রকৃতপক্ষে সুফিদর্শন অতীন্দ্রিয়বাদ বা নিগুঢ় কোন ব্যাপার নয়, বরং এটা হচ্ছে জ্ঞানের একটি আঁধার।

তিনি প্রায়ই তাঁর কিছু কিছু কাজকে প্রকৃত সুফি শিক্ষার কেবল প্রাথমিক স্তর হিসেবে বর্ণনা করেন। ঠিক যেরকম সাহিত্য পাঠের জন্য লেখাপড়া শেখাকে প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

'মনস্তত্ব পরিস্থিতির সাথে সঠিকভাবে পরিচিত না হলে, সেখানে কোন আধ্যাত্মিকতা বা আত্মিকতা আসে না। সেখানে মনের আচ্ছন্ন অবস্থা এবং আবেগপ্রবণতা থাকলেও সেটা এক্ষেত্রে ভুল।' তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, 'কেউ যদি অনুতাপশূন্য বা অসংশোধিত মনের কোন ব্যক্তিত্বের উপর আধ্যাত্মিকতা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে. . . তাহলে সেখানে কেবল একটি বিকৃতি বা বিকার সৃষ্টি হবে।' একারণেই *দা সুফি* বইটি থেকে শুরু করে এর পরবর্তী প্রায় অধিকাংশ বই ছিল মনোবিজ্ঞানধর্মী। এগুলো মূলত মানুষের নফস-ই-আম্মারা বা মিথ্যা অহংবোধের উপর আক্রমণের দিকে নিবদ্ধ ছিল। 'আপনাকে আমার কিছুই দেওয়ার নেই, কেবল সেই পথ দেখাতে পারি যে, কীভাবে অনুসন্ধান বা তালাশ করা বুঝতে হয়। তবে আমার মনে হয় আপনি জানেন যে, আপনি তা করতে পারেন।'

তিনি তাঁর কাজে শিক্ষামূলক কাহিনী এবং কৌতুকরস ব্যবহার করে ভালো ফল পেয়েছেন। বিস্ময়কর উপাখ্যানের রোগ নিরাময় ভূমিকা এবং এই গল্পগুলো থেকে যে নব নব পরিপ্রেক্ষিত প্রকাশিত হয়, তার উপর ইদ্রিস শাহ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। দলগতভাবে এই গল্পগুলো পড়ে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করাটা ইদ্রিস শাহের স্টাডি সার্কেলের সদস্যদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হতবুদ্ধিকর বা আজব এই কাহিনীগুলো যেভাবে ছাত্রদের চেতনায় তাদের অজান্তে আলোড়ন তুলতো, তা নিয়ে স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটির মনোবিদ্যার অধ্যাপক রবার্ট অর্নস্টেইন ও তার সহযোগী মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছিলেন। তাঁর সাথে আরো ছিলেন মনোবিজ্ঞানী চার্লস টার্ট, বিখ্যাত লেখক টেড হাফস এবং সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ঔপন্যাসিক ডরিস লেসিং। এরা সবাই ইদ্রিস শাহের ধারণা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

১৯৬০ সালে ইদ্রিস শাহ ও অর্নস্টেইনের সাক্ষাত হয়। ইদ্রিস শাহ তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, অর্নস্টেইন তাঁর একজন আদর্শ সহযোগী হিসেবে শিক্ষাকে সম্মোহন বা মনঃসমীক্ষণের ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করতে পারবেন।

তিনি অর্নস্টেইনকে যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর খলিফা বা ডেপুটি বানালেন। অর্নস্টেইন *দা সাইকোলজি অব কনশাসনেস* নামে একটি বই রচনা করলেন, যা মনস্তাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবী মহলে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি একই বিষয়ে আরো কয়েকটি বই রচনা করলেন।

দার্শনিক ও প্রকৃতি বিজ্ঞানী হেনরি বর্টফট ইদ্রিস শাহের রচনা সংকলনের গল্পগুলো ব্যবহার করে মনের বিভিন্ন অভ্যাসের উপমা হিসেবে তুলে ধরেন। *বর্টফটের দা হোলনেস অব ন্যাচার: গোথেস ওয়ে অব সাইন্স* বইটিতে *দা টেইলস অব দরবেশ*, *দা এক্সপ্লয়েটস অব দি ইনকমপ্যারাবল মোল্লাহ নাসিরউদ্দিন* এবং এ *পারফিউমড স্করপিয়ন* দরবেশের গল্প অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

মূল ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমিতে বিন্যস্ত সুফি দর্শনের শিক্ষনীয় গল্পগুলো, ইদ্রিস শাহ মৌখিক এবং লিখিত আকারে প্রচারের মাধ্যমে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সুফি দর্শনকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া। বিভিন্ন স্তরের অর্থ থাকার কারণে এই গল্পগুলো শিশুসহ সব বয়সের মানুষের উপযোগী ছিল। তিনি সুফি দর্শনের গল্পকে একটি পীচ ফলের সাথে তুলনা করেছিলেন: 'একজন লোককে পীচ ফল দেওয়া হলে, এর বহিরাবরণ দেখে লোকটি আবেগাপ্লুত হতে পারে। তারপর পীচ ফলটি খাওয়ার পর এর সুস্বাদ অনুভব করবে.. . বিচিটা ফেলে দিতে পারে বা এটা ভেঙ্গে এর ভেতরের সুস্বাদু শাঁস বা অন্তর্বীজ পাবে। এটাই হচ্ছে ভেতরের লুকায়িত গভীরতা।' আর এভাবেই ইদ্রিস শাহ তাঁর পাঠক বা শ্রোতাদের সুফি দর্শনের গল্পগুলো গ্রহণ করতে আহ্বান জানালেন। ভেতরের শাঁসটি খুলে বের করতে ব্যর্থ হয়ে গল্পটিকে কেবল একটি মজার বা ভাসা ভাসা বিষয় হিসেবে বিবেচনা করলে, একজন মানুষ একটি পীচ ফলের বাইরের চেহারা দেখার চেয়ে আর বেশি কিছুই এতে পাবে না। আর যারা ভেতরের গল্পটা আত্মস্থ করবে, এর অন্তস্থ অর্থ তাদের মন ছুঁয়ে যাবে।

ইদ্রিস শাহের ছেলে তাহির শাহ তাঁর রচিত *ইন এরাবিয়ান নাইটস* বইটির কয়েক জায়গায় তাঁর বাবার গল্প বলার বিষয়টি উল্লেখ করেন। তাহির শাহ প্রথমে আলোচনা করেন কীভাবে ইদ্রিস শাহ শিক্ষামূলক কাহিনীগুলো ব্যবহার করেছেন: 'আমার বাবা কখনও আমাদেরকে বলেননি গল্পগুলো কিভাবে কাজ করে। তিনি এর মধ্যেকার বিভিন্ন স্তর উন্মোচন করে বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ বা সত্য তথ্য ইত্যাদি প্রকাশ করেননি। অবশ্য তা করারও প্রয়োজন ছিল না, কেননা সঠিক পরিস্থিতিতে কাজ করে গল্পগুলো নিজেদের স্বরুপ প্রকাশ করতো।' তারপর তাহির শাহ ব্যাখ্যা করেন কিভাবে তিনি এই সব গল্প ব্যবহার করে জ্ঞান বিতরণ করতেন: 'আমার বাবা সবসময় একটা না একটা গল্প হাতে রাখতেন, আমাদের মনোযোগ সেদিকে ফেরাতে। কিংবা কোন একটি ধারণা বা চিন্তা আমাদের মনে জাগিয়ে তোলার জন্য ব্যবহার করতেন। তিনি বলতেন যে, প্রাচ্যের এই বিপুল কাহিনী সম্ভার হচ্ছে অভিধানের মতো। এগুলো হচ্ছে জ্ঞানের আঁধার, যা পড়া যায়, উপলব্ধি এবং সযত্নে লালন করা যায়। তাঁর কাছে এই গল্পগুলো নিছক আনন্দদায়ক ছাড়াও আরো বেশি কিছু ছিল। তিনি মনে করতেন এগুলো হচ্ছে জটিল মনস্তাত্ত্বিক দলিল, মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকে আহরিত এবং পরিশীলিত জ্ঞানের সমষ্টি। একজনের কাছ থেকে আরেকজন, পরম্পরায় মুখের কথায় যা এখন পর্যন্ত চলে এসেছে।'

এরপর বইটিতে তিনি গল্পগুলোকে শিক্ষার উপাদান হিসেবে আলোচনা করেছেন। এক একটি গল্পের শেষে তাঁর বাবা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার উদ্ধৃত করেছেন:

এই গল্পগুলো হচ্ছে প্রযুক্তিগত তথ্য বা দলিল, এগুলো অনেকটা মানচিত্র বা এক ধরনের ব্লুপ্রিন্টের মতো। আমি কেবল মানুষকে দেখাতে চাই কীভাবে এই মানচিত্রগুলো ব্যবহার করতে হবে, কেননা ওরা এগুলো ভুলে গেছেন। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে, এটা তো একটা আজব ব্যাপার- কাহিনীর মাধ্যমে শিক্ষা বা জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। তবে আজ থেকে বহু দিন আগে এভাবেই মানুষ জ্ঞান বিতরণ করতেন। সবাই জানতেন কিভাবে গল্প থেকে শিক্ষা নিতে হয় বা জ্ঞান আহরণ করতে হয়। এরা বিভিন্ন স্তর ভেদ করে ভেতরটা দেখতে পারতেন, ঠিক যেভাবে আপনি একটি বরফের স্তরের নিচে হিমায়িত একটি মাছ দেখতে পান। তবে যে পৃথিবীতে আমরা এখন রয়েছি, তা এই কৌশল ভুলে গেছে, যে কৌশল অবশ্যই একদিন তাদের ছিল। ওরা গল্পগুলো শুনতো এবং পছন্দ করতো, কেননা এই গল্পগুলো তাদেরকে আনন্দ দিত, মনকে উদ্দীপ্ত বা কৌতূহলী করে তুলতো। তবে ওরা প্রথম স্তরটা ভেদ করে বরফের ভেতরটা দেখতে পেত না। গল্পগুলো ছিল সুন্দর একটা দাবার ছকের মতো: আমরা সবাই

জানি কিভাবে দাবা খেলতে হয় আর এই জটিল খেলায় আমরা এমনভাবে আকর্ষিত হই যে, আমাদের সকল দক্ষতা বা মানসিক শক্তি এতে নিঃশেষিত হয়ে যায়। মনে করুন এই খেলাটি শত শত বছর আগে একটি সমাজ-সভ্যতা থেকে হারিয়ে যায়, তারপর ওরা একটি সুন্দর দাবার ছক আর গুটি খুঁজে পেল। তখন সবাই এর চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখে জিনিসগুলোর প্রশংসা করবে। কল্পনাও করতে পারবে না যে, এভাবে চোখে দেখে প্রশংসা করা ছাড়াও এই সুন্দর জিনিসটি বা দাবার বোর্ডের আর কোন ব্যবহার আছে। এই গল্পগুলোরও অন্তর্নিহিত অর্থও একইভাবে হারিয়ে গেছে। এক সময় সবাই জানতো কিভাবে এগুলো নিয়ে খেলতে হয়, কিভাবে এর জটিলতার রহস্যোদ্ধার করতে হয়। তবে আজ সেই নিয়মগুলো ওরা ভুলে গেছে। তাই আমাদের এখন আবার লোকজনকে দেখাতে হবে যে, কিভাবে এই খেলাটি খেলতে হয়।

-তাহির শাহ, এরাবিয়ান নাইটস।

সুইডিশ অধ্যাপক ওলাভ হ্যামার তাঁর রচিত *সুফিজম ইন ইউরোপ এন্ড নর্থ আমেরিকা (২০০৪)* পুস্তকে এরকম একটি গল্পের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। এতে বলা হয়েছে একজন লোক মাটিতে তার চাবি খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তার একজন প্রতিবেশি পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো যে, চাবিটা কী সে আসলে এখানেই হারিয়েছে, এর উত্তরে লোকটি বললো, 'না, আমি এটা ঘরেই হারিয়েছি, তবে এখানে আমার ঘরের ভেতরের তুলনায় অনেক বেশি আলো আছে।' এই কাহিনীটির বিভিন্ন রূপ বহু বছর ধরে পাশ্চাত্য জগতে লোকের জানা। এটা হচ্ছে একই ধরনের গল্পের একটি দৃষ্টান্ত, যা বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিরাজমান রয়েছে। এটাই ছিল ইদ্রিস শাহের উপকথা সংকলন *ওর্য়াল্ড টেইলস* পুস্তকের মুখ্য ধারণা।

ব্রিটিশ ঐতিহাসিক পিটার উইলসন (১৯৩৬-) তাঁর রচিত *নিউ ট্রেন্ডস এন্ড ডেভেলাপমেন্টস ইন দি ওর্য়াল্ড অব ইসলাম* (১৯৯৮) গ্রন্থে একই রকম একটি কাহিনী উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এখানে একজন দরবেশকে তার শিক্ষক বা আলিমের গুণাবলীর বর্ণনা করতে বলা হয়েছে। দরবেশ ব্যাখ্যা করলেন যে, আলিম সুন্দর কবিতা রচনা করেন এবং তাকে উৎসাহিত করেন আত্মত্যাগ ও মানুষের সেবা করার জন্য। প্রশ্নকর্তা সাথে সাথে এই গুণাবলীর প্রশংসা করলেন, তবে দরবেশ তাকে ভর্ৎসনা করলেন: 'এই গুণাবলীর কথা আলিম আপনাকে বলতেন।' তারপর দরবেশ গুণাবলীর একটি তালিকা বলতে শুরু করলেন, যা আলিমকে আসলে একজন উপযুক্ত শিক্ষক হতে সহায়তা করবে: 'হযরত আলিম আজিমি আমাকে বিরক্ত করে তুললেন, যার কারণে আমি এই বিরক্ত হওয়ার কারণ বা উৎস খুঁজতে শুরু করলাম। আলিম আজিমি আমাকে রাগিয়ে তুললেন, যাতে আমি আমার

ক্রোধ অনুভব করে তা রূপান্তরিত করতে পারি।' তিনি ব্যাখ্যা করলেন যে, আলিম আজিমি নিজেকে দোষারোপের সংস্কৃতি অনুসরণ করতেন, তিনি ইচ্ছা করেই নিজের উপর প্রবল আক্রমণ চালাতেন, যাতে তাঁর ছাত্র এবং সমালোচক উভয়েরই ব্যর্থতা প্রকাশ করতে পারেন এবং তাদেরকে দেখা বা বোঝার সুযোগ দেন যে, তারা আসলে কী। 'তিনি আমাদেরকে অচেনা বা আজব কিছু দেখাতেন, যাতে সেই আজব বিষয়টি মামুলি বা বহু ব্যবহৃত উক্তি হয়ে দাঁড়ায় এবং আমরা বুঝতে পারি যে, এটা আসলে কী।'

সংস্কৃতি এবং ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি

ইদ্রিস শাহ সকল সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত মূল উপাদান এবং ব্যক্তির আচরণের পেছনের নিগূঢ় অন্যতম হেতুও উন্মোচন করতে আগ্রহী ছিলেন। বাহ্যিক চেহারা এবং উপরিগত বিষয়ের প্রতি পাশ্চাত্যে যে মনোযোগ দেওয়া হয়, তা তিনি মূল্যহীন বলেছিলেন। কেননা এটা কেবল প্রচলিত রেওয়াজ এবং স্বভাব প্রতিফলিত করে। তিনি সংস্কৃতির মূল উৎস এবং মানব গোষ্ঠির অবচেতন ও মিশ্র সক্রিয়তা বা অনুপ্রেরণার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তিনি নির্দিষ্ট করে দেখিয়েছেন কীভাবে ব্যক্তিক ও দলগত পর্যায়ে, কোন স্বল্পমেয়াদী বিপর্যয় অনেকসময় একটি আশির্বাদে পরিণত হতে পারে বা এর উল্টোটি হয়ে দাঁড়াতে পারে। অথচ এটা জানার পরও কিছু একটা ঘটলে মানুষ যে প্রতিক্রিয়া দেখায়, তার কোন হেরফের হয় না।

ইদ্রিস শাহ সাংসারিক দায়িত্ব বিসর্জন দিতে বলেননি; বরং তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে, একজন হবু ভক্ত বা শাগরেদ যে ঐশর্য অনুসন্ধান করছে, তা সে রোজকার জীবন সংগ্রাম বা জীবিকা থেকেই আহরণ করবে। তিনি মনে করেন বাস্তব কাজের মাধ্যমেই একজন অন্বেষক স্বেচ্ছাশ্রম করতে পারে। সাধারণ পেশাজীবী সুফিরা ঐতিহ্যগতভাবে যার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন এবং নিজেদের মধ্যে ভাব জাগাতে পারেন বা প্রয়োগ করেন, তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে এটা করা যেতে পারে।

ইদ্রিস শাহ তাঁর বইগুলোকে উত্তরাধিকারী সম্পদ মনে করেন। তিনি মনে করেন যখন তিনি থাকবেন না, তখন এই বইগুলো তাঁর কাজগুলো সম্পন্ন করবে। ইদ্রিস শাহের ছাত্ররা তাদের শিক্ষকের প্রকাশিত বইগুলো প্রচার ও বিতরণের কাজটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মতৎপরতা হিসেবে নিয়েছে।

জুলাই ১৯৭৫ সালে *সাইকোলজি টুডে* পত্রিকার সম্পাদক এলিজাবেথ হল ইদ্রিস শাহের একটি সাক্ষাতকার নেন। তিনি ইদ্রিস শাহকে প্রশ্ন করেন: 'মানবতার মঙ্গলের জন্য আপনি কী হওয়া উচিত মনে করেন?' ইদ্রিস শাহ এর উত্তরে বললেন: 'আমি আসলে যা চাই তা হচ্ছে, গত ৫০ বছরে মনোবিজ্ঞানের

বিষয়ে গবেষণা থেকে যে ফলাফল অর্জিত হয়েছে, সবাই যেন তা পড়েন, যাতে এই ফলাফলগুলো তাদের চিন্তার একটি অংশ হয়। ওরা দর্শনের এই বিশাল তথ্য এবং বাতিল জিনিসগুলো পেয়েছে ব্যবহার করার জন্য।'

ইদ্রিস শাহের ভাই ওমর আলি শাহও (১৯২২-২০০৫) একজন লেখক এবং সুফিদর্শনের শিক্ষক ছিলেন। ১৯৬০ সালের বেশ কিছু সময় এই দুই ভাই একত্রে ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিতেন, তবে ১৯৭৭ সালে ওরা একমত হলেন পরস্পরের মতের বিরোধিতা করার এবং এরপর ওরা দুইজন আলাদা পথে চলতে শুরু করেন। ১৯৯৬ সালে ইদ্রিস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর বেশ কিছু ছাত্র ওমর আলি শাহের আন্দোলনের সাথে জড়িত হন।

ইদ্রিস শাহের এক মেয়ে সায়রা শাহ ২০০১ সালে আলোচনায় আসেন, যখন তিনি আফগানিস্তানের নারীদের অধিকার নিয়ে *বিনিথ দা ভেইল* নামে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন। এছাড়া ইদ্রিস শাহের ছেলে তাহির শাহ একজন বিখ্যাত ভ্রমণ লেখক, সাংবাদিক এবং অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় ব্যক্তি।

ইদ্রিস শাহের বইগুলো ফরাসি, জার্মান, লাতভিয়ান, পোলিশ, রুশ, স্পেনিশ, সুইডিশ, তুর্কিসহ আরো অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

ইরান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং অনুবাদক ইভোনা নোউইকা ইদ্রিস শাহের টেইলস অব দরবেশ ১৯৯৯-২০০০ সালে পোলিশ ভাষায় অনুবাদ করে ২০০২ সালে বইটি প্রকাশ করেন। এরপর ২০০২ এবং ২০০৩ সালে যথাক্রমে *দি উইজডম অব ফুলস* এবং *দা ম্যাজিক মনাস্টেরি* বই দুটোরও অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

সমালোচকরা সুফি দর্শন বিষয়ে ইদ্রিস শাহের বইগুলোর উচ্চ প্রশংসা করেন। ১৯৬৯ সালে বিবিসি টিভির '*ওয়ান পেয়ার অব আই*' নামে একটি ডকুমেন্টারিতে তিনি ছিলেন আলোচনার বিষয়। এছাড়া তাঁর রচিত *দি ওয়ে অব দা সুফি* এবং *রিফ্লেক্শন* বইদুটো বিবিসির 'দা ক্রিটিক' প্রোগ্রামে বছরের সেরা বই বিবেচিত হয়। ১৯৭৩ সালের ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড বুক ইয়ারে ইদ্রিস শাহ ছয়টি প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। ইসলামিক স্কলার জেমস ক্রিটচেক (৬ জুলাই ১৯৩০-) ইদ্রিস শাহের *টেইলস অব দরবেশ* বইটির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, বইটি চমৎকারভাবে অনূদিত হয়েছে।

১৯৭৩ সালে প্রকাশিত *সুফি স্টাডিস : ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট* শিরোনামের পুস্তকে ইদ্রিস শাহের কাজ নিয়ে ইতিবাচক মূল্যায়ন করা হয়। এতে যারা লিখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক লরেন্স ফ্রেডারিক রাশব্রুক উইলিয়াম (১৮৯০-১৯৭৮), পোলিশ লেখক ও স্থপতি রম লান্ডাউ (১৮৯৯-১৯৭৪), ভারতের প্রধান বিচারপতি ও উপরাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ

হেদায়েতউল্লাহ (১৭ ডিসেম্বর ১৯০৫-১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯২), হাঙ্গেরিয় লেখক ও ইসলাম বিশেষজ্ঞ গুউলা জার্মানাস (৬ নভেম্বর ১৮৮৪-৭ নভেম্বর ১৯৭৯), লেফটেন্যান্ট জেনারেল স্যার জন ব্যাগট গ্লাব পাশা (১৮৯৭-১৯৮৬), শ্রীলংকার রাজনীতিবিদ ও মানবতাবাদী স্যার রাজিক ফরিদ, পাকিস্তানি ঐতিহাসিক ও লেখক ইশতিয়াক হোসাইন কোরাইশি (২০ নভেম্বর ১৯০৩-২২ জানুয়ারি ১৯৮১), তুর্কি সাংবাদিক ও লেখক আহমেদ এমিন ইয়ালমান (১৮৮৮-১৯৭২), ইসলামিক স্কলার ও অধ্যাপক ডক্টর মাহমুদ ইউসুফ শাহরাবি এবং সুফি লেখক নাসরুল্লাহ এস. ফাতেমি।

দা কাবুল টাইমস পত্রিকা জানায় আফগানিস্তানে *ক্যারাভেন অব ড্রিমস* (১৯৬৮) বইটি আফগান জনগণের মাঝে বিপুল আগ্রহ উদ্রেক করে এবং বইটির উচ্ছসিত প্রশংসা করা হয়। বইটি মূলত ছোট গল্প, উপকথা ও প্রবাদপ্রবচনের একটি সংকলন, যা আফগানিস্তানের বিভিন্ন এলাকার জনগণের লিখিত ও লোকমুখে প্রচারিত জনশ্রুতি থেকে নেওয়া হয়েছে। *দা আফগানিস্তান নিউজ* সূত্রে জানা যায়, ইদ্রিস শাহের *দা সুফিস* গ্রন্থটি 'দর্শন ও বিজ্ঞান বিশ্বে আফগানিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা' তুলে ধরেছে। এটি হচ্ছে সুফিদর্শন এবং দরবেশদের মানবতাবাদ উন্নতি পদ্ধতির প্রথম এবং পূর্ণাঙ্গ প্রামাণিক পুস্তক।

১৯৮০ সালে আফগানিস্তানের বিখ্যাত কবি অধ্যাপক খলিলুল্লাহ খলিলি, তাঁর 'স্বদেশী বন্ধু *আরিফ* (আলোকপ্রাপ্ত সুফি) দা সৈয়দ ইদ্রিস শাহের,' কাজের প্রশংসা করে বলেন, বিশেষত ইসলাম ও সুফি দর্শনের মহান শিক্ষকদের অন্তর্নিহিত চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে তিনি যে চমৎকার এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছেন, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।'

ভারতের দা *হিন্দুস্তান স্ট্যার্ন্ডাড* পত্রিকা, ইদ্রিস শাহের *ক্যারাভেন অব ড্রিমস* পুস্তকটির ভূয়সী প্রশংসা করেছে।

দা ইন্সিটিটিউট অব ক্রস কালচারালের এক্সচ্যাঞ্জ নামে কানাডার একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান ইদ্রিস শাহ রচিত ছোটদের বইগুলো কানাডা, মেক্সিস্কো এবং আফগানিস্তানের শিশুদের মাঝে বিতরণ করেছে।

ইদ্রিস শাহের কাজের একজন গোঁড়া সমর্থক, ঔপন্যাসিক ডোরিস লেসিং ১৯৮১ সালে একটি সাক্ষাতকারে বলেন : 'সুফি দর্শন আমি ইদ্রিস শাহের কাছে শিখেছি। এটা ছিল প্রাচীন কালের একটি শিক্ষণীয় বিষয়, যা এই স্থানে এবং এই সময়েও ব্যবহারযোগ্য। এটি প্রাচ্য থেকে ওগরানো বা উদ্‌গিরণ করা কোন বিষয় নয়।' ১৯৯৬ সালে ইদ্রিস শাহের মৃত্যুর খবর শুনে *দা ডেইলি টেলিগ্রাফ* পত্রিকায় তিনি বলেন যে, *দা সুফি* বইটির কারণেই তিনি ইদ্রিস শাহের সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি বলেন, এযাবত তিনি যত বই পড়েছেন, তার মধ্যে এই বইটিই

ছিল সবচেয়ে আশ্চর্যরকম। এটি তাঁর জীবনকে বদলে দিয়েছে। ইদ্রিস শাহের সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'এমন বিস্ময়কর বা অনন্যসাধারণ বিষয় আমাদের কালে আর নেই। ইদ্রিস শাহের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে ডোরিস লেসিং বলেন যে, তিনি হচ্ছেন বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন মানুষ, ভদ্র এবং বিনীত। ৩০টি বছর তিনি তাঁর একজন ভালো বন্ধু এবং শিক্ষক ছিলেন।

ভারতীয় দার্শনিক এবং অতীন্দ্রিবাদী রাজনিশ, যিনি পরবর্তীতে ওশো নামে পরিচিত হন, তিনি ইদ্রিস শাহের কর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, *দা সুফিজ* বইটি 'একটি হীরক খন্ডের মতো। এই বইটিতে তিনি যা করেছেন, তার মূল্য অপরিসীম।' তিনি আরো বলেন যে, 'ইদ্রিস শাহই মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে পাশ্চাত্যে পরিচিত করেছেন এবং এই কাজটি করে তিনি অসম্ভব একটি উপকার করেছেন। তাঁর ঋণ পরিশোধ করার মতো নয়। মোল্লা নাসিরুদ্দিনের ছোট ছোট গল্প বা অনুকাহিনীগুলোকে তিনি আরো সুন্দর করেছেন। কেবল সঠিকভাবে অনুবাদই করেননি, বরং আরো সুন্দর করে গল্পগুলোকে আরো মর্মভেদী আরো স্পষ্ট করে তুলেছেন।'

আমেরিকান লেখক ও বুদ্ধিজীবী গোরে ভিদাল ইদ্রিস শাহের রচনা সম্পর্কে মত প্রকাশ করে বলেন যে, 'এগুলো লেখার চেয়েও পড়া আরো কঠিন।' ইদ্রিস শাহ যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, অত্যন্ত মহৎ বা মহত্তম কিছু করার ক্ষমতা থাকলেও, মানুষ তার অন্তরে যা সুপ্ত রয়েছে, তার অনেক নিচু স্তরে থাকতে পছন্দ করে। অলসতা, লোভ, ভীতি এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ তাদের নিজেদের নিচু স্বভাব দ্বারা পরিচালিত এবং শৃঙ্খলিত হয়। তিনি বলেন সদ্‌গুণ দূরবর্তী কোন আজব বিষয় নয়, যা মানুষ আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করে, বরং তা হচ্ছে মানব উন্নয়নের একটি বাস্তব বিধান। যে গুণাবলীর উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন, তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছেঃ উদারতা বা মহত্ব, রসবোধ, দয়াশীলতা, চিন্তার স্বচ্ছতা এবং কান্ডজ্ঞান।

১৯৯৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর তিন ছেলেমেয়ে বর্তমানে ইদ্রিস শাহ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তাঁর রচনাগুলো পুনঃপ্রকাশ করে চলেছেন।♦

সূত্রঃ জে এইনহর্ন ফ্রম উইলসন, পিটার (১৯৯৮)। 'দা স্ট্রেঞ্জ ফেইট অব সুফিজম ইন দা নিউ এইজ।' নিউ ট্রেন্ডস এন্ড ডেভেলাপমেন্টস ইন দা ওয়ার্ল্ড অব ইসলাম, পিটার বি. ক্লার্ক।

বায়তুল হিকমা
ইতিহাসের বিখ্যাত গ্রন্থাগার

মঈনুল হক চৌধুরী

মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির তীর্থ কেন্দ্র বায়তুল-হিকমা নবম শতাব্দীর একটি সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণাগার, গ্রন্থাগার এবং অনুবাদশালা, যা থেকে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি একটি স্বর্ণযুগে উপনীত হয়। উল্লেখ্য, ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে মুসলমানরা আন্তরিকভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবদ্দশায় তাঁর সাহাবী ও অনুসারীদের মধ্যে জ্ঞানের চর্চা ও বিকাশের বিরাট কর্মচাঞ্চল্য পরিচালিত হয়। তাঁর সময়ে সাহাবীদের শিক্ষাদানের জন্য মসজিদে নববী কেন্দ্রিক যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে সেটাই প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃত। বস্তুত ইসলামের প্রাথমিক কাল থেকে শুরু করে উমাইয়া শাসনকাল (৭৫০ খ্রি.) পর্যন্ত মসজিদই ছিল জ্ঞান চর্চার বৃহত্তম বিদ্যাঙ্গন। এ প্রসঙ্গে ইতিহাস পর্যালোচক ড. আহমদ আমীন এর মতে, "প্রকৃতপক্ষে তখন মসজিদই ছিল জ্ঞান চর্চার বৃহৎ অঙ্গন। মসজিদ তখন নিছক উপাসনালয় ছিল না, সালাত আদায়ের পাশাপাশি সেখানে

বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হতো। এমনকি কাযী সাহেবের আদালত ও বিচারসভাও বসতো মসজিদেই। অবশ্যই এখানে আমরা এটুকু শুধু বলতে চাই যে, মসজিদ সে যুগে বিদ্যা চর্চার সর্ববৃহৎ ক্ষেত্র ছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় মিসরের আমের মসজিদ, বসরার মসজিদ, কুফার মসজিদ, মক্কা ও মদীনার হারাম শরীফ প্রভৃতি মসজিদ জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকাই পালন করত। বস্তুত ইসলামের অন্যতম মূলনীতি হিসাবেই রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম মসজিদকে জ্ঞান চর্চার অঙ্গন বানিয়েছিলেন। ফলে গোটা উমাইয়া শাসনকাল পর্যন্ত মসজিদের এ ভূমিকা অব্যাহত ছিল।" শুধু তাই নয়, উমাইয়া যুগের পরেও ইসলামী সভ্যতায় মসজিদ গ্রন্থাগার জ্ঞান-চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে। কায়রোর তুলুন মসজিদ, আলেপ্পোর জামে মসজিদ, তিউনিসার যায়তুন মসজিদ, আল আকসা মসজিদ, বাগদাদের যায়দিয়া মসজিদ, কায়রোর আল আজহার মসজিদ, মরক্কোর আল কায়রোয়ান মসজিদ, সিরিয়ার দামেস্ক মসজিদ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইসলামের ইতিহাসে আব্বাসীয় যুগকে (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার স্বর্ণযুগ বলা হয়।

নিঃসন্দেহে এ যুগ মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। আব্বাসীয় শাসকগণ এশিয়া ও ইউরোপের বিশাল অংশ নিয়ে সুবিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। এ সময়ে জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা-দীক্ষা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। আব্বাসীয় খলিফা আল মানসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) ৭৬২খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ নগরীকে নতুন রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দেন। এরপর

থেকে প্রভাবশালী আব্বাসীয় খলীফাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ, অনুবাদকরণ ও গবেষণায় এক অত্যুজ্জ্বল তীর্থভূমির মর্যাদা লাভ করেছিল এ বাগদাদ। আল মানসুরের বিদ্যানুরাগ ও জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম সমাজে পুস্তকপ্রীতি আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পায়। 'বাইতুল হিকমা' বা House of Wisdom ছিল সেই সময়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বৃহদাকার গ্রন্থাগার। আব্বাসীয় খলীফা হারুনুর রশিদ (শাসনকাল ৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) 'বাইতুল হিকমাহ্' প্রতিষ্ঠা করেন। তার সুযোগ্য পুত্র খলিফা আল মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.)-এর সময় এটি উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে। আর তাই তো নবম শতকের মধ্যভাবে 'বাইতুল হিকমাহ' ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার। এ বিশাল গ্রন্থকেন্দ্র ছিল একাধারে গ্রন্থাগার, অনুবাদকেন্দ্র, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং মানমন্দির। এটিকে ইসলামী স্বর্ণযুগের প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে খলীফা আল মামুন ছিলেন বহু মানবিক গুণে গুণান্বিত একজন বিদগ্ধ শাসক। জ্ঞানের আদান-প্রদানের জন্য আল মামুন অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিকে বাইতুল হিকমাহতে নিয়ে আসেন। বায়তুল হিকমায় ফার্সী, গ্রিক, মিশরীয়, কালদীয়, ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থ সংগৃহীত হতো। তাঁর উজির ইয়াহিয়া বার্মাকী বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদের বাগদাদে আমন্ত্রণ করেছিলেন। আরবদের 'অগাস্টাস' খ্যাত এ 'বায়তুল হিকমাহ্' একাধারে গবেষণাগার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং লাইব্রেরী হিসেবে পূর্ণাঙ্গ জৌলুসপ্রাপ্ত হয়। খলীফা আল মামুন বাগদাদের এ গ্রন্থাগারটিকে বৈশ্বিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলেছিলেন। তাতে সে যুগেই প্রায় ৭মিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছিল। বীজগণিতের জন্মদাতা মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খারেজমি (৭৮০-৮৫০ খ্রি.) সেই বিরাট গ্রন্থাগারের একজন লাইব্রেরীয়ান ছিলেন। তিনি ভারত বিষয়ক একটি বই লিখেছিলেন– যার নাম 'কিতাবুল হিন্দ।' গণিত শাস্ত্রে শূন্যের মূল্য অপরিসীম। এই শূন্য [০] আবিষ্কার তার বলে দাবি করা হয়। 'হিসাব আল জাবর ওয়াল মুকাবালা' বইটি তার বিরাট অবদানের একটি উত্তম নিদর্শন। এ সময়কালটিতে বায়তুল হিকমায় বিদেশী গ্রন্থের আরবী অনুবাদের ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়। খলিফা আল মামুন ইহুদি, পারসি, খ্রিস্টান, মুসলিম নির্বিশেষে পণ্ডিতদেরকে তাঁর অনুবাদে নিযুক্ত করেছিলেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যকর্মে স্থপতি ও প্রকৌশলী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কাজ করতেন। তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সরকারি দিনপঞ্জির হিসাব রাখতেন এবং সরকারি কর্মী হিসেবেও কাজ করতেন। তারা একই সাথে চিকিৎসক ও পরামর্শদাতাও ছিলেন। খলীফা আল মামুনের কাছে সৌজন্য স্বরূপ আসতো জ্ঞানের অমূল্য সব সংগ্রহ প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। তিনি সহল বিল হারুন নামক এক পারসিক ডাক্তারকে নিযুক্ত করলেন মাজুসী সভ্যতার

মূল্যবান বই পুস্তকগুলো অনুবাদ করার জন্য। মামুনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে দরবারের সবার ভেতরই অনুরূপ প্রেরণা দেখা দিল। ফলে এ যুগে যেসব বই-পুস্তক অনূদিত হয়েছিল তা গ্রিক, ফারসী, কালভী, কিবতী ও শামী ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিল। এই লাইব্রেরীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব অনুষদের পুস্তকসমূহ সংগ্রহ করা হয়। এখানে প্রায় ছয় লক্ষেরও বেশী পুস্তক সংগৃহিত হয়।

'এছাড়া বায়তুল হিকমাহ্' 'খিজানাতুল হিকমাহ' নামেও পরিচিত ছিল। এটি ছিল বাগদাদের সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানমন্দির। এ গ্রন্থাগারের ভূমিকা প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারকেও ছাড়িয়ে যায়। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন জাতির পণ্ডিতদের সম্মেলন ঘটেছিল এই প্রতিষ্ঠানে। খলিফা মামুনের সময় বায়তুল হিকমার তিনটি বিভাগ ছিল। যথা– গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন এবং অনুবাদকেন্দ্র। জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার এই বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্রে বহু অনুবাদক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, লেখক ও বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিবর্গের সমাগম ঘটেছিল। এখানে কাজ করতেন এমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হলেন জাফফার মুহাম্মাদ ইবনে মুসা ইবনে শাকির, অ্যারিস্টটলের রচনাবলির অনুবাদক আরবদের দার্শনিকরূপে পরিচিত আল-কিন্দি, হিপোক্রিটাসের অনুবাদক হুনায়ন ইবনে ইসহাক, সাইদ বিন হারুন, সাবিত বিন ফেরা, উমর বিন ফারুখান আল বিবার, বিশিষ্ট গণিতবিদ আল খয়ারিজিমি প্রমুখ। এসব মুসলিম পণ্ডিত প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, রোমান, চীনা, ভারতীয়, পারসি, মিশরীয়, উত্তর আফ্রিকীয়, গ্রিক ও বাইজান্টানীয় সভ্যতা থেকে বহু মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করেন এবং অনুবাদের মাধ্যমে সংকলন করেন। আরবি ছাড়াও গ্রিক, ফরাসি, আরমাইক, হিবরু, সিরিয়াক, লাতিন, ভারতীয়সহ বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থগুলো অনুবাদ করা হয়। প্রথম দিকে দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা হলেও কালক্রমে বিজ্ঞান, চিকিৎসা, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার মতো বিষয় নিয়ে গবেষণা করা হতো। উল্লেখ্য,'বায়তুল হিকমার' অন্যতম বিষয় ছিল মানমন্দির ও মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। পরে বায়তুল

হিকমার সঙ্গে মানমন্দির যুক্ত করা হয় এবং খ্যাতিমান জ্যোতির্বিদ ইয়াহিয়াসহ অনেকেই মানমন্দিরে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন এবং মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করতেন, যা ভারতীয়, গ্রিক ও পার্সিয়ানদের থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র ছিল। এসব মুসলমান ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রমে বিশ্বের সামনে উঠে আসে অ্যারিস্টটল ও হিপোক্রিটাসের মতো দুর্দান্ত দার্শনিক উক্তি এবং পিথাগোরাস, প্লেটো, ইউক্লিড, পাটিনাস, গ্যালন, চরক, আর্যভট্ট ও বহ্মগুপ্তের লেখাসহ বহু জ্ঞানীকুলের গ্রন্থ অনুবাদ করা হয়, যারা আজকে বিজ্ঞানের দুনিয়ায় উজ্জ্বল মুখ। মুসলমান পণ্ডিতেরা যদি সে সময় এসব মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ ও অনুবাদ করে সারাবিশ্বের প্রান্তে ছড়িয়ে না দিতেন, তাহলে আজকের এই সোনালি বিজ্ঞান কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যেত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সারাবিশ্বে 'বায়তুল হিকমার' প্রভাব তৈরিতে খলিফা মামুন অনুবাদকদের উৎসাহিত করার জন্য অনুবাদের বিনিময়ে অনুবাদকর্মের ওজনের স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করতেন। আব্বাসীয় খলীফা মামুনের দৃষ্টিতে শিক্ষা ছিল এমন একটি ভিত্তি যার উপর মানবাত্মার শান্তি নিহিত। তাই তিনি রাজ্য জয় অপেক্ষা সৃজনশীল সাংস্কৃতিক বিজয়কে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সাংস্কৃতিক চর্চার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য তিনি 'বায়তুল হিকমাকে' কেন্দ্রস্থল হিসেবে ব্যবহার করে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও মকতব প্রতিষ্ঠা করেন। এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর লাখারাজ সম্পত্তি নিয়োজিত করেন। এছাড়া শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারের জন্য এবং বায়তুল হিকমার অনুবাদ কার্যাবলীকে নির্বিঘ্ন করার জন্য খলিফা মামুন চীনাদের অনুকরণে কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় প্রচুর কাগজ উৎপাদনের ফলেই শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। উল্লেখ্য, হিজরীর তৃতীয় শতকে কিছু চীনা কাগজ ইরাকে আমদানী হয়। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই এটি দেশীয় শিল্পে পরিণত হয়। যদিও খলিফা হারুন অর রশীদ সর্ব প্রথম আরবদেশে কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

ঐতিহাসিক আমীর আলীর মতে খলীফা মামুনের রাজত্বকালকে ইসলামের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও গৌরবময় যুগ বলে যে মন্তব্য করেছেন তার মূল কারণ হল 'বায়তুল হিকমার' অবদান। 'বায়তুল হিকমায়' গবেষণারত পারসিক, হিন্দু, গ্রীক, খ্রিস্টান, আরবীয় প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মনীষীদের মাধ্যমে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল ও বৈদেশিক রাজ্য হতে নানা দেশের জ্ঞান ভান্ডারে সঞ্চিত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আহরণ করেন। খলীফা মামুনের দরবারের উজ্জ্বল রত্ন লব্ধ প্রতিষ্ঠা অনুবাদক হুসাইন ইবনে ইসহাক ছিলেন 'বায়তুল হিকমার' মহাপরিচালক। তাঁর নেতৃত্বে এখানে অনুবাদ কার্যাবলী চলত বিরামহীনভাবে। তিনি নিজে গ্রীক ভাষার শিক্ষা লাভ করে গ্রীক অঞ্চল হতে পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের কাজে নিয়োজিত হন এবং

এসব আরবিতে অনুবাদ করেন। এছাড়া 'বায়তুল হিকমার' অন্যান্য অনুবাদকগণ Galen, Pual, Euclid, Ptolemy প্রমূখ মনীষীরা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলি এবং বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটল এবং প্লেটোর মূল্যবান গ্রন্থাদি আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। এ সময় লিউকের পুত্র কোস্টার এর মাধ্যমে গ্রীক সিরিয়া ও ক্যালডিয় ভাষার গ্রন্থাদি, মানকাহ এবং দাবান নামক ব্রাহ্মণ মনীষীদের দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থাদি আরবিতে অনুবাদ করা হয়। খালিদ বিন আব্দুল মালিক, ইয়াহইয়া বিন আল মানসূর, সিন্দু বিন আলী প্রমূখ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদগণ বায়তুল হিকমার উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তারা মানুষের স্থাপিত মানমন্দিরে গবেষণা করে তৎকালে পৃথিবীর আকৃতি, গ্রহ, বিষুব রেখা, ধূমকেতু, উল্কাপিন্ড প্রভৃতি বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেন। উল্লেখ্য, বায়তুল হিকমা চিকিৎসার জগতেও আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। এখানকার গবেষক উহান্না বিন মুসাওয়াহ নামক চিকিৎসা বিজ্ঞানী রসায়ন শাস্ত্রের উপর জারির ভস্মীকরণ ও লঘুকরণ সূত্র দু'টি আবিষ্কার করেন। জিব্রাঈল ইবনে বখতিয়ার এসময়ের একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী ছিলেন। এছাড়া যুগ শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও ভূগলবিদ মুহাম্মাদ বিন মূসা আল খাওয়ারিজমী (৭৮০-৮৫০ খ্রি.) বায়তুল হিকমার একজন মৌলিক গণিত গবেষক ছিলেন। গণিত শাস্ত্রের উপর "কিতাবুল জাবর ওয়াল মুকাবালাহ" গ্রন্থটি তার অনবদ্য সৃষ্টি। এ গ্রন্থটি ষোড়শ শতাব্দির পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে টেক্সট বুক হিসেবে পড়ানো হতো। তাছাড়া বায়তুল হিকমায় ধর্মতত্ত্ব, হাদিস শাস্ত্র এবং ভাষাতত্ব প্রভৃতির ব্যাপক চর্চা হতো। ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে খলীফা মামুনের পাণ্ডিত্ব ছিল। হাদিস সংগ্রহকারি হিসেবে ইমাম বুখারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৬বছর ধরে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে ষাট লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেন এবং সেগুলোর মধ্য থেকে কেবল ৭২৭৫টি হাদিসকে নির্ভুল হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এখানে ধর্ম দর্শনের উপর আরো অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। বায়তুল হিকমার বদৌলতে মৃতপ্রায় সাহিত্য পুনর্জীবন লাভ করে। আধুনিক ফার্সি কবিতার স্রষ্টা মার্ভবাসী কবি আব্বাস বায়তুল হিকমার খ্যাতিমান কবি ছিলেন। ধর্মভীরু ও নিবেদিত প্রাণ সাহিত্যিক আবুল আতাহিয়া (৭৪৮-৮২৮ খ্রি.) ধর্মীয় ভাবধারা সমৃদ্ধ কবিতা রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। রুচিসম্মত হস্ত লিখন বা সুকুমার শিল্পের বিকাশে বায়তুল হিকমার অবদান অনস্বীকার্য। হাম্বলীর বাণীগুলো সুন্দর এবং পরিষ্কার লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে আরবগণ হস্ত লিখন পদ্ধতির আবিস্কার করেছিল। আর রায়হানী বায়তুল হিকমার প্রখ্যাত লিপিকার ছিলেন। তার নামানুসারে একটি লিপির নামকরণ করা হয় রায়হানী। বায়তুল হিকমার

গবেষকগণ উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

গ্রীক, পারস্য ও ভারতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মীয় অনুভূতির পরিবর্তে বিচার বুদ্ধি, যুক্তি তর্ক, প্রগাঢ় অনুশীলনী দ্বারা মুসলমানগণ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখতে সক্ষম হন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের এই সাফল্য বিজ্ঞান বা সাহিত্যের কোনো বিশেষ শাখায় সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি বুদ্ধিবৃত্তির যাবতীয় শাখায় প্রসার লাভ করেছিল। বায়তুল হিকমা জ্ঞান বিজ্ঞানে যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিল এর ফলে ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগ সূচনা হয়েছিল। ঐতিহাসিক মুইর বলেন, এই সমস্ত মনীষীদের পরিশ্রমের ফলে মধ্য যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপীয় জাতিগুলোর সাথে তাদের অথচ বিস্তৃত পৈত্রিক সম্পদ গ্রীসের বিজ্ঞান ও দর্শনের সাথে পুনর্মিলন ঘটে। অনেক ঐতিহাসিক একে The golden age of Islamic civilization বলে অভিহিত করেছেন। আবার অনেকে একে Augustan age বলেও আখ্যায়িত করেছেন। উল্লেখ্য, ১২৫৮সালে হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমণের সময় দীর্ঘ ১২ দিন অবরোধের পর খলিফা মুতাসিম বাধ্য হয়ে মোঙ্গলদের কাছে নতি স্বীকার করেন। অতঃপর মোঙ্গলরা বাগদাদে প্রবেশ করে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালায়। সাধারণ জনগণ ও খলিফাসহ পুরো শহর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুপুরীতে রূপান্তরিত হয়। মোঙ্গলদের হাতে আব্বাসীয় আমলের দীর্ঘ ৫০০বছরের বেশি সময় ধরে জ্ঞানবিজ্ঞানের যে সোনালি ধারা বজায়ের আলোকবর্তিকা 'বায়তুল হিকমাহ' ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কথিত রয়েছে, হত্যাকাণ্ড চলার সময় যদিও পারস্য মনীষী নাসিরুদ্দিন তুসি ৪০ হাজার গ্রন্থ অন্যত্র সরিয়ে নেন, তবু এত বিপুল পরিমাণ বই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় যে বইয়ের কালিতে আব্বাসীয় প্রাসাদসংলগ্ন টাইগ্রিস নদীর পানি কালো হয়ে যায়। হালাকু খানের হাতে 'বায়তুল হিকমা' ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ৩২জন খলিফার সবাই এটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এর পরেও এ কথা সত্য যে মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় 'বায়তুল হিকমা' নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। এই অদ্বিতীয় গ্রন্থাগার ও বিজ্ঞানাগারের মাধ্যমে আব্বাসীয় আমলে জ্ঞান বিজ্ঞান, শিক্ষা দীক্ষা কৃষ্টি ও সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধন করে তারা শুধু স্বর্ণ যুগেরই সূচনা করেননি, বরং অবলুপ্ত প্রাচীন মানবসভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে তারা বিশ্ব সভ্যতায় অবদান রাখতে সক্ষম হন। যা ইতিহাসের পাতায় আজও স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।♦

স্বদেশীবাজারে গলাগলি করে বাস করে তুলসি ও মুনসি

শামসুল ফয়েজ

স্বদেশী বাজারে গলাগলি করে বাস করে
তুলসি ও মুনসি;
তাদের নগণ্য জীবনযাপনে সারাটা বছর
আলো দেয় সম্প্রীতির রশ্মি।
স্বদেশী বাজারে একটা দড়িতে হাওয়ায় হাওয়ায়
দোল খায় তাদের ধুতি এবং লুঙ্গি।
এখানে সেখানে কেউ কারো প্রতি বিদ্বেষের
তাড়নায় কখনো ফুঁকে না হিংসার উন্মত্ত চুঙ্গি।
কোন কোন রাতে ওরা ভাগ করে খায়
ভাবী ও বৌদির বানানো উৎসবের খাবার,
দুই জনে মিলে রাত করে দেয় নিশ্চিন্তে কাবার।
কখনো ভীষণ শীতে শিমুলতুলায় লম্বা বালিশের
শাপলা আঁকা কাভারে মাথা রেখে দুজনে আরামে ঘুমায় একই কাঁথায়।
সারা দিনের শ্রান্তিতে ঘুম নেমে আসে ওদের নিশঙ্ক চোখের পাতায়।
কোন দূষিত প্ররোচনায় এখানে জ্বলে না কোনদিন ক্রুদ্ধ দাবানল।
এখানে বছর জুড়ে তুলসি-মুনসিদের হৃদয়ে হৃদয়ে
অবিরাম ফোটে অমল ধবল নিদাগ কমল।

অশ্রান্ত আকাশ

সেলিম মাহমুদ

তাঁকে ছুঁয়ে যাও আকাশের বিস্তারে
আর ঘন অরণ্যের রাগ ঝিঁঝিটে
তাঁকে ছুঁয়ে যাও উত্তম আবেগে
আর ভরা বসন্তের প্রথম প্রভাতে
যেন অক্ষৌহিণী প্রতিটা সকালে সকল মঙ্গলে
গা ছুঁয়ে যায় ছোট্ট নদীটির তীরে।

তাঁকে ছুঁয়ে আর পাবো না;
কোনো একদিন পেয়েছিলাম–

এটাইতো এখনকার সরল বর্ণনা।

একটি গোলাপের জন্য

মুস্তফা হাবীব

নীল সমুদ্রের নোনাজল গায়ে মেখে একাকী
দিগন্তের দিকে যাচ্ছি, যেতে যেতে পথ ফুরোবে,
এতোকাল ছিলাম অশ্বারোহী রাজপথিকের বেশে,
হাজার একটি স্বপ্নের অন্য আকাশ বিনির্মাণে
ছুটছি কখনও নিসর্গের মায়াজালে মুগ্ধ হয়ে
কখনও এই পৃথিবীর জঞ্জাল দুপায়ে দলে।

নন্দিতার জাগতিক সাধ আহ্লাদ এক পাশে রেখে
গোলাপ ফোটাতে ভিজিয়েছি দুচোখ কান্নায়
ভেবেছি এসব একদিন মুক্তা হীরা মোতি পান্না হবে।

শুধু এখন আর একটি গোলাপ ফোটাবার জন্য
বেঁচে থাকতে চাই পৃথিবীর নৈসর্গিক আলোয়ে।
হ্যাঁ, শুধুমাত্র একটি গোলাপ.....
সে গোলাপটি হতে পারে এমন
মহাকালের পাথার বেয়ে ঘ্রাণ ছড়াবে অশরীরী।

কখনও তার পাপড়ি ঝরবে না অবহেলায়
কখনও তার সৌরভ বিলীন হবে না ঝড়ে বন্যায়,
চন্দ্র সূর্যের মহিমা যতদিন থাকবে অমলিন
ঠিক ততদিন গোলাপটি বেঁচে থাকবে শাশ্বত সুন্দর;
শুধু সেই গোলাপটির জন্য চোখ ভাসাই নীলিমায়।

করতলে জ্বলন্ত অঙ্গার

আসাদুল্লাহ্

ঘোর শত্রু, খুনি লুচ্চা ধর্ষক দালাল
তখনই সিন্ডিকেট বুড়ো আঙুলের বাহাদুর!
যারা বিভীষণ তারা পতাকা বাহক
যারা বিভীষণ তারা সনদ শিকারী;
বীরপুত্র কন্যাগণ প্রাণমূল্যে চড়া
মাটির টানেই মহাপ্রাণ
সনদ হরিণালোভে হায়েনা শকুন তারা নন।

ফসলের আগাছার মতো
জীবনের বাস্তবতা সমাজ আমার,
পরিবেশ অনিঃশেষ অস্থিরতাময় নিম্নচাপ;
চরিত্রের কী বদল
বেড়াগুলো দেখি শস্যখেকো!
দুই নৌকায় পা রেখে মাঝিগণ ভয়ংকর যাত্রী
কালের সন্তান তারা স্বদেশের কাল;

কি একাত্তর কি পঁচাত্তর ওরা এক;
বারবার রক্ত বোমা আগুন বুলেট
সুপরামর্শে উত্তম উপদেষ্টা দুষ্টু ইবলিশ;
বিপরীতে বুলির খৈ
ক্লিব পুরনো পাপীর চাপাবাজি,
আজও তারাই বোকা যারা অকপট গুণীজন
বুদ্ধিমান তো তারাই যারা বর্ণচোরা বৈষয়িক।
বড্ড বেড়ে গেছে মাত্রা আদর্শ ও রুচির মঙ্গার
জননী স্বপ্নের দৌড়ে একা হয়রান,
এই আমার সমাজ করতলে জ্বলন্ত অঙ্গার।

রঙ দিয়ে রঙ মুছে ফেলি

চন্দনকৃষ্ণ পাল

ক্লিনশেভড মুখে আজ দেখে বাকরুদ্ধ হই।

ঘাড় অব্দি নেমে আসা চুলে
আবাস বানিয়েছে পোকা মাকড়েরা,
তবু তুমি নিস্পৃহ রবে?
ভাবতে পারি না।

ভাবনায় এমন ছিলো না তো
রাজপুত্র ভেবে ক্যানভাসে দিয়েছি তো রঙ
উজ্জ্বল আলোতে ছিলে ফেলে আসা দিনে
আজ দেখি অন্ধকারে তারার রোদন।

আমি বিমর্ষ হই
রঙ সব মুছে ফেলি অন্য রঙ দিয়ে।

বায়ুতরঙ্গের বাহাস

মাহফুজ রিপন

নৈঃশব্দের ঘোর যখন জড়ো হয় হৃদমাঝারে
শব্দযানের হাহাকার খাবি খায় চার দেয়ালে।

বায়ুতরঙ্গে শ্রবণ আসে লাল রক্তের করোটি
অন্ধকারে ঢোল বাজে আরও বাজে সারেঙ্গী।

সুর অসুরের লড়াই চলে মনোপলি কল্পনায়
স্পন্দন ছড়িয়ে গেছে বিষ হর্জের সিমানায়।

৬০ ডেসিবল শব্দ এসে আঘাত করলো শ্রুতিতে
নয়েস রিডাকশন কানে পরে স্টাইলটা বেড়েছে।

প্রিয় নবী

পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

শান্তি মন্ত্রে দীক্ষা দেবেন বলে
তিনি এসেছিলেন একদিন
সমাজের অশান্তি করতে বিলীন
প্রচার করেছিলেন ইসলাম
তিনি আর কেহ নন
শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

তাঁর কঠোর সাধনালব্ধ জ্ঞানের পরশে
বর্ষাধারার মতোই পৃথিবীতে তখন অবিরাম শান্তি বরষে।
আলোকিত হয় আরব বিশ্ব
কোটি-কোটিজন তাঁর শিষ্য।
দূর করেন কূপমন্ডুকতা
যতো ছিলো জমা অজ্ঞানতা, কলুষতা!
প্রিয় বসুন্ধরা পায় মানবতা
প্রেম-প্রীতি ও উদারতা
ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলেন মনে
বন্ধ করেন হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি জনে-জনে
তিনি আর কেহ নন
অন্ধকার ও অশান্তির যুগে এনেছিলেন ইসলাম
প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

প্রচণ্ড শীতে

নীহার মোশারফ

অপরূপ সৃষ্টি তাঁর
যিনি পৃথিবীময় অনুপম রূপবিস্তার করেন।
শৈশব থেকে প্রৌঢ়ত্বের বাঁকে
দিগন্তব্যাপী আলো-ছায়ার খেলায়
মানুষ অনন্ত রহস্য খোঁজে।
তিনি রহস্যের সিংহাসনে।
বিশ্ব চরাচরে সুখ-দুখের দোলাচলে
তলে-অতলে গভীর মর্ম কথা
দূর করে বিষণ্ন পথের ধুলোবালি সব।
মজিদ দুনিয়া চিনে।
আখেরাত অনেক দূরে
হিসাবের খাতায় বাকি
মিথ্যের দেনা-পাওনা যত।
কেউ কেউ ঘরের চালাকি বুঝে
জনতার সামনে ছোট্ট বিড়াল।
প্রচণ্ড শীতে ফজরের আযান কানে আসলেও
গরম কাঁথায় শয়তানের মন্ত্রপাঠ
কার নামায কাজা হয়? ফেরেশতারা দেখেন।
ধর্ম অন্তরে থাক
সম্প্রীতির আদলে জাগুক বাংলার প্রকৃতি।

এ মাটি আমার

তাহমিনা কোরাইশী

পনেরো আগষ্টের নির্মমতা আব্বাস আলীকে তাড়িত করেছে। পাগল প্রায় মানুষটি আর নিজের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। জীবনের বড় পরিবর্তন ঘটে এই মেধাবী শিক্ষকের। বছরের পর বছর ঘুরেছে পথ প্রান্তরে একটু শান্তির আশায়। তারপর এসে ঠাঁই মিলেছে টুঙ্গিপাড়ায়। যেখানে ঘুমিয়ে আছেন জাতির পিতা। বাঙ্গালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। যার আদর্শিক রক্ত বহমান এই আব্বাস আলীর মন মননে। দুঃখ ক্ষোভ ব্যথায় কুঁকড়ে যাওয়া শরীর মন নিয়ে কত দিন আর বেঁচে থাকা যায়!

মনে পড়ে আব্বাসের সেই ব্যতিক্রমি দিনগুলোর কথা। কখনও আনন্দ কখনও বেদনা কখনও নিত্য বয়ে চলা সাদামাঠা দিন। সেই সাত মার্চের ভাষণের দিন রেসকোর্স মাঠে। বুক ভরা আশা নিয়ে গিয়েছিল স্বাধীনতার ঘোষণা শুনবে বলে। হাজার হাজার লক্ষ কোটি জনতার ভিড়ে কৌশল খাটিয়ে যতদূর এগিয়ে বসা যায়। সামনে তাকে বসতেই হবে। খোকা ভাই এর চেহারা দেখা জরুরী। এতোটাই আবেগপ্রবণ দুসাহসী আব্বাস আলী। ঠিক সামনে জায়গাও করে নেয়। শুরু হয়ে যায় নেতার ভাষণ। তাঁর মুখের একটি করে শব্দ কখনও ফুল হয়ে কখনও উল্কা কখনও আতোশবাজির মত পড়ছে। উদ্দীপ্ত উল্লোসিত উদ্ভাসিত উদগ্রীব জনতা নেতার কথাগুলো মাথায় মনে জপমালার মত গেঁথে চলেছে। বাংলার অলিখিত শাসনকর্তার নির্দেশনামা মাথা পেতে গ্রহণ করেছে। যাদু মন্ত্রের বশিকরণ আজ আব্বাসও। তিনি দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।' মাঠে লোকে লোকারণ্য ছিল। অবশেষে সভা শেষে বাড়ি ফেরার পালা। আব্বাস আলি আজ আর বাড়ি ফিরবে না। পিঁপড়ের সারিতে পথ চলা। যাবে বত্রিশ নম্বর বাড়িতে। সীমাহীন উত্তেজনায় ডুবে আছে আব্বাস। হাজার প্রশ্ন তাকে জর্জড়িত করে চলেছে কখন মিয়া ভাইকে পাবে। কখন উনাকে সাহস করে কথাগুলো বলতে পারবে। নচেৎ শান্তি পাবে না। সময়ের অপেক্ষায় আব্বাস আলী। খোকা ভাই আব্বাসকে ভীষণ স্নেহ করেন। উনার সুনজরে আছে আব্বাস। নিষ্ঠাবান একজন কর্মী কিন্তু আলাভোলো মানুষ। সুযোগ পেয়ে খোকা ভাই এর গা ঘেঁষে দাঁড়ায় মাথা নিচু করে বলে- আমার একটা কথা ছিল।

খোকা ভাই বলে বল্ কি বলতে চাস।

বলতে চাই- আজ যে লক্ষ কোটি জনতা রেসকোর্সের মাঠে ছিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত আপনার ভাষণ শুনছিল। তারা তো আপনারই অনুসারী। তাদের সবাইকে নিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে সেনা বেড়াক দখল করতে বাধা ছিল না। সৈন্যরা পালানোর সুযোগ পাইতো না। জনগণ আপনার পক্ষেই ছিল, আছে। হড়হড় করে কথাগুলো শেষ করে। খোকা ভাই আব্বাসের মাথায় হাত রেখে বলে– বুদ্ধি আরো একটু ঝানু হোক। তখন বুঝবি কেনো এমন কাজ করতে পারি নাই। আর স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার বাদ রইলো কি? আমার তো সব দিক ভাইব্যা কাজ করতে হবে। আমার নির্দেশে আজ থাইক্যা কাজ কাম করবে বাংলার মানুষ। আমার ইশারা ইঙ্গিত বুঝেছে আমার মানুষ। তোর মাথা ঠাণ্ডা কর। সাবধানে থাকবি। সামনে আরো বিপদ আছে। বুঝে শুনে পথ চলবি। আব্বাস লজ্জা পেয়ে যায়। মাথা নিচু করে খোকা ভাই এর পা ধরে সালাম করে। বাসার উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায়। আব্বাসের বাসা বেশি দূরে নয় কলাবাগানের ভেতরে গলি। রাতে আর

ঘুম আসে না আব্বাসের। কাল থেকে কি হবে ভাবতে ভাবতে কখন যে দু'চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসে।

আব্বাসের বাবা আব্বাসকে নিয়ে বেশ চিন্তায় থাকেন। তার এই ছেলে যেমন দুরন্ত তেমন মেধাবি তেমনি অস্থিরতায় ভোগে। কৈশোর থেকেই রাজনীতি এবং আদর্শিক পিতা খোকা ভাই এর প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং আকর্ষণ তার চিরন্তন যা আব্বাসকে স্থির থাকতে দিত না। আব্বাসের বাবা ছেলেকে একটু গৃহে আবদ্ধ বা ঘরের প্রতি আকৃষ্ট করতে ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। আব্বাস সবে অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। আব্বাসের আপত্তি এখনও সে ছাত্র। চাকরী নেই ইনকামের পথ খোলা নেই। বাবা তুড়ি মেরে আব্বাসের কথা উড়িয়ে দিয়ে সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে বললেন– ঐসব নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। যতদিন চাকরি করার উপযুক্ত না হও। আমি তোমার ঘর ভাড়া সংসার চালানোর দায়িত্ব নিলাম। আব্বাস গড়রাজি হয়েও কবুল পড়ে কারণ মেয়েটি তার ভালোবাসার পাত্রী। তার চাচাতো বোন। ভবঘুরে জীবনে বিয়ে তাকে লাগাম টেনে ধরবে বলেই বাবার এই পলেসি। কিন্তু পারেনি মুনমুন তাকে গৃহবন্দি করে রাখতে। মুনমুন তাকে আরো উৎসাহিত করেছে। মুনমুন আব্বাসের কাজে কখনওই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। দেশ ও দশের জন্য ভালোবাসা, জাতির প্রতি শ্রদ্ধা। এ আগুন নেভার নয়। যতটা জ্বলবে ততই খাঁটি সোনার পরিণত হবে আব্বাস সে বিশ্বাস মুনমুনের।

৭ই মার্চ থেকে ২৫ শে মার্চ বেশি দূরের পথ নয়। মিছিলে স্লোগানে দিন যায় আব্বাস আলীর। ঘুরে ফিরে বত্রিশ নম্বরেই ফিরে আসে। খোকা ভাইকে এক মুহূর্ত না দেখে থাকতে পারে না। যত দেখে ততই মুগ্ধ হয় আব্বাস। হাজারও কাজের চাপে কতটা ধিরস্থির থাকতে পারে খোকা ভাই প্রমাণ। আব্বাসকে দেখলেই কাছে ডাকবে। আব্বাস সোজা গিয়ে খোকা ভাই এর পায়ের কাছে বসবে। কখনও স্নেহের সুরে কখনও ধমকের সুরে নানা কথা বলেন খোকা ভাই। ওর অস্থিরতা দেখে খোকা ভাই বলেন– কি রে মাথা ঠণ্ডা হয়েছে? মাথা গরম করিস না। গরম মাথায় ভালো কাজ পাওয়া যায় না। সামনে আমাদের অনেক কাজ। খোকা ভাই, শতভাগ সত্যি। সেদিন ভুল করে আপনারে কথাটা বলছিলাম। এখন চিন্তা করি আস্তে আস্তে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়েছে।

ঠোঁটের কোণে পাইপটা ধরিয়ে মৃদু হেসে পরে বলেন সামনে দুর্গম পথ। নিজেকে বাঁচিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। মরার আগেই মরবি না। জীবনে কোন কিছুই সহজে প্রাপ্তি হয় না। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। বলে খিদে পেয়েছে। যা খেয়ে যা।

এতো আদর ভালোবাসায় দুচোখ গড়িয়ে জল আসে আব্বাসের এই ভবঘুরে আব্বাস খোকা ভাই এর পছন্দের মানুষ। কত নামিদামী মানুষের আনাগোনা উনার বাসায়। আব্বাস তো নগণ্য তবুও উনার স্নেহধন্য। হাঁটতে হাঁটতে আব্বাস ডাইনিং টেবিলের কাছে গিয়ে নিজের হাতেই চা বিস্কুট নিয়ে খায়। এ বাড়ির মানুষগুলো ওকে চেনে। স্নেহও করে। হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির ভেতরে দিয়ে পেছন দিকটাতে চলে যায়। যেখানে বাকবাকুম পায়রাদের ঘর। ওদের খাবার ছিটিয়ে দিয়ে ওদের সাথে আলাপচারিতায় নিজের কিছু স্বপ্ন ওদের ডানায় বেঁধে দিয়ে আসে। ঐ বাড়ির এই পায়রাগুলো ওর অনেকদিনের চেনা। আদরের। এ বাড়ি মাটি ঘাস লতাগুল্ম সবই ওর ভীষণ প্রিয়। এই বাড়িটিতে এলে আর বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় না আব্বাসের। কী এক গভীর মমতার টানে আবদ্ধ হয়ে থাকে। পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত রাজনীতির উত্থান-পতন রাজপথের শ্লোগান মিছিল। অলিখিত শাসকের রাষ্ট্র পরিচালনা নির্দেশনামা দেশের মানুষ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে। ইয়াহিয়া, ভুট্টো, মুজিবের সাথে বৈঠকের টালবাহানা চালাচ্ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতার হাতে রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা দিতে পশ্চিমাদের দ্বিধা দ্বন্দ্ব প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। আব্বাসের মনে পড়ে সেই পঁচিশে মার্চের ভয়াল রাতের কথা। কি এক বিভৎস ভয়ংকর ভয়ার্ত ভাবে দৃশ্যপট বদলে দেয়। সারা রাত নারকীয় তাণ্ডবে মৃত্যুপুরীতে বাংলার মানুষ। এখনও মনে হলেই সারা গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। চারদিকে সে কি গোলাগুলির শব্দ, ভারী মেশিন গানের শব্দ, বারুদের গন্ধ ধোঁয়া, আগুন, গোগো শব্দে রাক্ষুসে ট্যাঙ্কগুলির বিকট আওয়াজ। পুড়ছে পুলিশলাইন শান্তিনগরে, পুড়ছে পিলখানায়। নিরীহ মানুষের ওপর এভাবে আক্রমণ। ভাবা যায়! যদি একই দেশের মুসলমান এই ভাই ভাই হবে তবে কার বিরুদ্ধে এই অস্ত্র। এতো রক্তপাত! ক্ষমতার লড়াই। বাঙালি জাতিকে দাবিয়ে রাখার নগ্ন আক্রমণ। যুদ্ধ তো অনিবার্য। খুব ইচ্ছে আব্বাসের খোকা ভাইকে দেখে আসবে। ঐ বাড়ির মানুষগুলোর কি পরিণতি কে জানে! আব্বাসের বুক কেঁপে ওঠে। একটা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধি, কেমন আছেন তিনি। ভেতরে ভেতরে শূন্যতা অস্থিরতা হাহাকার চীৎকার। কি করবে কোথায় যাবে। কিছুই করার নেই। ধরা পড়লে বিপদ। মুনমুন কেবল চেয়ে থাকে আব্বাসের দিকে। শিটকে যাওয়া শরীরটা সোজা করে দাঁড়াতে পারছেনা। ভয়ে মুনমুনের দাঁতের সাথে দাঁতের পাটি খটখট করে বাড়ি খাচ্ছে। শরীর কাঁপছে গলা শুকিয়ে কাঠ। মুনমুনকে কাছে টেনে সান্তনা দেয় আব্বাস। দেখি পথ ঘাটের অবস্থা। এতো তাড়াতাড়ি এ আঁধার দূর হবার নয়। ভয় পেয় না মুনমুন তোমাকে বড় আপার কাছে মোহাম্মদপুরে দিয়ে আসবো। তাদের সাথেই খুলনায় মা বাবার কাছে চলে যেও। এই বিপদের মধ্যে আব্বাসকে ছেড়ে যেতে ওর মন সায় দিচ্ছে

না। তবুও কি করবে বাধ্য হয়েই যেতে হলো দেশের বাড়িতে মুনমুনকে। আব্বাসের জন্য চিন্তার শেষ নেই।

অবশেষে খবর পেলো সেই রাতেই পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছে বঙ্গবন্ধুকে। উনাকে নিয়েই তো পশ্চিমাদের যত ভয়। যাকে বাংলার মানুষ ভালোবাসে। যার নির্দেশে এ দেশের মানুষের রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে। ভয়তো পাওয়ারই কথা। দেশে ইয়াহিয়া সরকার থাকতেও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে রাষ্ট্র চলেছে। কতটা ক্ষমতাধর আমাদের নেতা।

নিজের অস্থিরতা কমাবার চেষ্টা করে। যে কথা তাকে তিনি বলে গেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করে। নিজেকে প্রস্তুত করে মুজিবের আদর্শিক সৈন্য হিসেবে গড়ে তুলতে। যোগাযোগ করেছে নেতাদের সাথে কর্মীদের সাথে। গোপনে পার হয়েছে বর্ডার। পৌঁছে গেছে মেলাঘর ক্যাম্পে। ট্রেনিং নিয়েছে, গেরিলা হিসেবে প্রস্তুত করেছে নিজেকে। এতো ধৈর্য্য সহ্য গুণ তার মধ্যে এলো কি করে। খোকা ভাই এর অবর্তমানে উনার কথাগুলো পরিবর্তন এনেছে আব্বাসের মধ্যে। নিজেকে চিনতে শিখেছে আব্বাস। প্রাণ বাজি রেখে যুদ্ধ করেছে। শত্রুবাহিনী বাংলাদেশ-ভারত মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে সেই রেসকোর্সের মাঠে। অভূতপূর্ব অবিস্মরণীয় ঘটনা সে দিন দেখেছে বিশ্ব। বাঙ্গালীর জয়। বাংলাদেশের জন্ম প্রত্যক্ষ করেছে আব্বাস। স্বাধীনদেশের বাতাস বুক ভরে টানে আব্বাস। তারপর চলে যায় খুলনায় মুনমুনের কাছে। মুনমুনের কোলে চাঁদের আলোয় আলোকিত করে আছে পুত্র সন্তান। বিজয়ের আনন্দের সাথে নিজের সংসার জীবনের আনন্দ যুক্ত হলো। আব্বাসের বিদায় বেলায় অন্তঃসত্ত্বা ছিল মুনমুন। মুনমুনকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ অশ্রুতে ভেসে যায় আব্বাসের চারদিক।

ফিরে আসে ঢাকা শহরে নিজের ঠিকানায়। এতো আনন্দেও যেনো পরিতৃপ্ত হয় না আব্বাসের মন। তার চোখ খোঁজে আরো একজনকে। যার আদর্শের অনুসারী সে। অবশেষে এলো সেই উৎসব শুভক্ষণ ১০ ই জানুয়ারী। বঙ্গবন্ধু ঢাকায় পৌঁছলে তাঁকে অবিস্মরণীয় গণসংবর্ধনা জানানো হয়। বিমান বন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ১০-১২ লক্ষ জনতার স্মরণকালের মহাসমাবেশ। অশ্রুসিক্ত নয়নে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। পরের দিন বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

দেশের মানুষের আনন্দের সীমা পরিসীমা নেই। আব্বাস আনন্দ ধরে রাখতে পারে না। ভেবে পায় না কি করবে। আগের মত যখন তখন ঐ বাড়িতে যাওয়া সমীচীন নয়, সে বুঝে। তবুও মন যে পড়ে থাকে বত্রিশ নম্বর বাড়িটায়। যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। নিজে সন্তানের বাবা হয়েছে। সন্তানের নাম

রেখেছে খোকা। আজকাল একটু বুঝদার হয়েছে আব্বাস। তবুও বুঝে শুনেই সময় হিসেব করেই যায় ঐ বাড়িতে। তার খোকা তাহলে ভাই যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। ভুলেননি আব্বাসকে কাছে ডেকে মাথায় হাত রেখে বলেছেন- মাথাটা ঠাণ্ডাই ছিল নতুবা এতো বড় ঝাপটা সামলেছিস কিভাবে। আব্বাসের চোখে আনন্দ অশ্রু। নীরবে নিভৃতে চোখের জলে ভাবের বিনিময়।

১৫ই আগষ্টের নির্মমতা সব মানুষের মত আব্বাস আলীকেও ভীষণ ভাবে নাড়া দেয়। পাগল প্রায় আব্বাস আলী পথে পথে বহুদিন। নেই শান্তি, নেই স্থিতি। পথই আব্বাসের ঠিকানা। কিভাবে বাঁচবে কাকে নিয়ে বাঁচবে আব্বাস আলী। তার আদর্শিক পিতা আজ নেই। কেবল চোখের সামনে রক্ত রক্ত রক্তাক্ত জনপদ। এ ভাবেই মাস ঘুরে যায়। মুনমুন বোঝে। কি করবে ভেবে পায় না। ওদের সন্তান খোকাকে আব্বাসের কোলে বসিয়ে মুনমুন বলে এই যে তোমার ভালোবাসা। ওকে বড় করো তোমার আদর্শে তোমার পিতার আদর্শে। খোকাকে কোলে নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে খোকার দিকে মুনমুনের দিকে। ওর কিছুই ভালো লাগছে না। কি যেনো এ ঘোরের মধ্যে ডুবে আছে। জীবনের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে।

একদিন সকালে মুনমুন ঘুম থেকে উঠে মুনমুন দেখে ঘরের দরজা খোলা। আব্বাস বাসায় নেই। খোকা ভাইয়ের এমন মৃত্যুকে মেনে নিতে পারছে না। স্ত্রী-সন্তান সবাইকে ছেড়ে সে চলে আশে টুঙ্গিপাড়া। খোকা ভাই এর কবরের পাশে ওর রাত যায় দিন যায়। কেবল মনে পড়ে সেই বত্রিশ নম্বর বাড়িতে খোকা ভাই এর সাথে কথোপকথন।

- বুঝেছিস আব্বাস। এর নাম স্বাধীনতা। মাথার ওপর দায়িত্ব কর্তব্যের বোঝা। যদি ভাড়া বাসায় থাকতি তবে যেমন তেমন করেই থাকতি। যখন তোর নিজের বাড়ি তখন আর কাজের অন্ত নেই। তাকে সুন্দর করে সাজাতে হবে। সে রকম দেশটা এখন নিজের। এখন অন্তহীন কাজ তো থাকবেই। আব্বাস চুপ করে মাথা নিচু করে বলে জ্বী–।

বঙ্গবন্ধু তারপর জিজ্ঞাস করেন মুখটা শুকনা কেনো? ভাত খাসনি? আয় আমার সাথে বস, নে খেয়ে নে।

আহা কত আদর ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছিল আব্বাস আলীকে। ভুলবে কি করে? রাষ্ট্র প্রধান হয়েও যে মানুষটি ভুলেনি আব্বাস আলীর মত সাধারণ একজন মানুষকে। স্বাধীনতা এনে দেশের সাত কোটি মানুষকে ভালোবেসে জীবনের বেশীর ভাগ সময় জেল খেটেছেন সংগ্রাম করে যুদ্ধ নির্দেশনা দিয়েছেন।

তাকে এই দেশের মানুষ মেরে ফেললো! মারতে পারলো? এরা পশুর থেকেও অধম।

মুনমুন চেনে তার স্বামীকে। তার গতিবিধি খুব ভালো করেই বুঝে। তার অন্তরদৃষ্টিতে জেনেছে আব্বাস কোথায়?

মুনমুন জানে কোথায় গেলে আব্বাসকে পাবে। ছোট্ট খোকাকে কোলে নিয়ে আব্বাসের বাবাকে সঙ্গী করে টুঙ্গিপাড়ার পথে বেরিয়ে পরে। মুনমুনের অনুমান সত্য। পেয়ে যায় আব্বাসকে টুঙ্গিপাড়ায়। জাতির জনকের সমাধির কাছাকাছি আব্বাস জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছে এই টুঙ্গিপাড়ায়। এই মাটিতে তার পিতার শরীরের ঘ্রাণে মিশে আছে। সে মাটি ছেড়ে আর কোথাও যাবে না সে।

মুনমুন বেশ কয়েকদিন আব্বাসের সাথে এ মাটিতে থেকে যায়। আব্বাস বলে আমার জন্য সময় নষ্ট করো না তোমরা। যতদিন বাঁচি এখানেই থেকে যাওয়ার ইচ্ছা। মুনমুন কিছু বলে না আব্বাসকে। কিছু বুঝাতে চেষ্টাও করে না। কেবল দু'চোখ গড়িয়ে জল বেয়ে পড়ে। মুনমুনের নয়নের জল কত কথা বলে চলেছে আব্বাসের সাথে। আব্বাস ওর চোখের জলের কাছে হার মানে। আব্বাস ভাবে ঢাকায় গিয়ে কি আর থাকতে পারবে। তবুও নিজের সংসারের জন্য ভাবতে হবে। মুনমুন যেনো আব্বাসের মনের দর্পণ। ওর মনের কথাগুলো বুঝে যায় বলে চলনা কিছু দিনের জন্য ঢাকায়। ভালো না লাগলে চলে এসো। আমিও তোমার সাথে চলে আসবো। এখানেই আমরা থাকবো। তুমি যেখানে থাকবে সে স্থানটি তো আমারও।

আব্বাসের মনটা কেনো যেনো একটু নরম হয়ে যায় মুনমুনের প্রতি, সন্তান খোকার প্রতি। মুনমুন তো ওর সব কথাই শোনে। আমি কি একটু তার কথা রাখতে পারি না? আব্বাস ভাবে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে। মুনমুনের চোখে চোখ রাখে। মুনমুনকে আব্বাস জড়িয়ে ধরে বলে– যাবো আমি তোমার সাথে যাবো। কিন্তু কথা দাও আমার মৃত্যুর পর এই টুঙ্গিপাড়ার মাটিতে আমার লাশটি দাফন করবে। কথা দাও। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মুনমুন বলে– এটা তো আমার কর্তব্য। যে মাটিতে তোমার পিতা ঘুমিয়ে আছেন সে পবিত্র মাটির ছোঁয়া তোমার শরীর পবিত্র করে দেবে। এ মাটি ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে! কথা দিলাম এ মাটিতেই তোমায় খুঁজবো জন্ম জন্মান্তর। তোমার ইচ্ছে পূরণ হবে, এখানেই খুঁজে পাবো তোমাকে বারবার। যেমন হারিয়ে যাওয়া তোমাকে খুঁজে পেলাম। ♦

২০২১ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী

আব্দুর রাজ্জাক গুরনাহ

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর

গাজী সাইফুল ইসলাম

‘পূর্ব আফ্রিকান হিসেবে আমরা প্রায়শই অন্য লোকদের চোখ দিয়ে বিশ্বকে দেখি, কিন্তু গুরনার মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজেদের দেখতে পাই।’ ২০২১ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর এভাবেই আব্দুর রাজ্জাক গুরনার মূল্যায়ন করেন তানজানিয়ার প্রকাশক এমকুকি বিজুয়া। কিন্তু নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগে পর্যন্ত তানজানিয়ার লোকেরা তাঁর সম্পর্কে খুব কমই জানত। তিনি মূলত তানজানিয়ান বংশোদ্ভূত বৃটিশ। ১৯৪৮ সালে আফ্রিকান দেশ তানজানিয়ার জাঞ্জিবারে জন্মগ্রহণ করেন গুরনাহ। ১৯৬০ সালে একজন শিক্ষার্থি হিসেবে বৃটেনে চলে আসেন। বর্তমানে তিনি কেন্ট বিশ্বাবদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য ও পোস্ট কলোনিয়াল স্টাডিজের ওপর অধ্যাপনা করছেন।

আফ্রিকান লেখকদের মধ্যে আব্দুর রাজ্জাক গুনরাকে এখন গ্রাউন্ড ব্রেকিং লেখক হিসেবে প্রশংসা করা হচ্ছে, অবশ্য নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর। কিন্তু ৭২ বছর বয়সী এই লেখকের জন্মভূমির তানজানিয়ার কেউ তাকে চিনত না, তাঁর বইগুলো তাঁর স্বদেশের বইয়ের দোকানগুলোতে শোভা পেত না। এ জন্য তাঁর

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ শোনার পর জাঞ্জিবারেরই আরেক লেখক অ্যালি সালেহ এই বলে মন্তব্য করেছিলেন যে, 'আপনি যদি এখানে (তানজানিয়ায়) তাঁর ছবি মানুষকে দেখান সবাই তাকে প্রথমবারের মত দেখবে।' তিনি আরও বলেছিলেন: 'তানজানিয়ার খুব কম লোকই তাঁর কাজ সম্পর্কে জানে।'

যাহোক, তাঁর প্রথম তিনটি উপন্যাস: *মেমোরি অব ডিপার্চার* (১৯৮৭), *পিলগ্রিমস ওয়ে* (১৯৮৮), *ডুটি* (১৯৯০) লেখা হয়েছিল মূলত সমকালিন ব্রিটেনে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ আগত অভিবাসীদের অভিজ্ঞতার আলোকে। চতুর্থ উপন্যাস *প্যারাডাইস* (১৯৯৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময়ের কলোনি শাসিত পশ্চিম আফ্রিকার পটভূমিতে। এতে ইউসুফ নামের এক বালকের গল্প বলা হয়েছে, যে পিতা-মাতার গরীবালয় ত্যাগ করে ধনী মামা (বা চাচা) আজিজের বাড়িতে ওঠেছে–পিতামাতার ঋণের বিপরীতে চাকর হিসেবে খাটুনি খাটার জন্য। *প্যারাডাইস* তখন বুকার ও হুইটব্রেড লিটারেরি প্রাইজের শর্টলিস্টে স্থান করে নিয়েছিল। অনেকে মনে করছেন, গুরনার নোবেল পুরস্কার বিজয়ে এ উপন্যাসটি যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু কিছু সমালোচক বলছেন যে, জোসেফ কনরাডের *হার্ট অব ডার্কনেস* উপন্যাসের সামারাইজ রূপ এটি। অন্যদিকে তাঁর *মেমোরি অব ডিপার্চার* (১৯৮৭) উপন্যাসটির চরিত্ররা তাদের ছোট্ট আফ্রিকান উপকূলীয় গ্রাম পেছনে ফেলে আসার যুক্তি নানাভাবে তুলে ধরে। আবার বিপরীত চিত্র পাওয়া *পিলগ্রিম'স ওয়ে'*তে (১৯৮৮)। এতে চিত্রিত হয়েছে এক মুসলিম ছাত্রের চরিত্র। তানজানিয়া থেকে যে ছোট্ট ইংরেজ শহরটিতে সে অভিবাসী হয়েছে–সেখানে তাকে একটি প্রাদেশিক বর্ণবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বাঁচার লড়াই চালিয়ে যেতে হয়।

তাঁর *অ্যাডমায়ারিং সাইলেন্স* (১৯৯৬) উপন্যাসটি একজন তরুণের গল্প বলে, যে জাঞ্জিবার থেকে ইংল্যান্ডে আসে অভিবাসী হয়ে আর এখানেই বিয়ে করে সংসারী হয় আর শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করে। তার স্ত্রী ও স্ত্রীর পিতা-মাতার কাছে মাতৃভূমি সম্পর্কে গল্প বলাই তার জন্য সবচেয়ে বেশি সুখকর বিষয়। কিন্তু ২০ বছর পর আফ্রিকা ফিরে তার গল্পের আয়নাটি চূর্ণ হয়ে যায়। আর *বাই দ্য সি*'তে (২০০১) পাঠক একজন বয়োবৃদ্ধ সালেহ ওমরকে পান, শরণার্থি হওয়ার পক্ষে তিনি যিনি অনেক বেশি বৃদ্ধ। এই বয়সেও তিনি ব্রিটেনে এসছেন। একদিন তিনি পরিচিত হন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক লতিফ মোহাম্মেদর সঙ্গে– যিনি কয়েক দশক ধরে এখানে আছেন। অপ্রত্যাশিত এ সাক্ষাতে বুকের কোণে লুকিয়ে থাকা পুরনো দিনের বহু স্বদেশিক গল্প উঠে আসে তাদের স্মৃতিচারণের আকারে।

২০০৫ সালে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস ডেসার্শন ২০০৬ সালের কমনওয়েলথ রাইটার প্রাইজের শর্টলিস্টে স্থান পায়। এরপর একে একে প্রকাশিত

হয় *দ্য লাস্ট গিফ্‌ট* (২০১১, *গ্রাভেল হার্ট* (২০১৭), এবং *আফটার লাইভস* (২০২০)। ২০০৬ সালে তিনি 'ফেলো অব দ্য রয়েল সোসাইটি অব লিটারেচার' নির্বাচিত হন।

এটাই বাস্তবতা। শরণার্থিদের দুঃখগাঁথার কথাকার গুরনাহ যদি ভাগ্যক্রমে জাঞ্জিবারেই থেকে যেতেন তাহলে নোবেল পুরস্কার পাওয়া তো দূরের কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। ব্রিটেনে তিনি বসবাস করছেন পাঁচ দশক। জীবনের সচল ক্যামেরায় জন্মভূমির যে দৃশ্যাবলী তাঁর ধারণ করা ছিল ব্রিটেনে বসে সে সবের তিনি নবায়ন করেছেন। অর্থ ও রাজনৈতিক মুক্তি মানুষকে নতুন দৃষ্টি দান করে। তানজানিয়ার জীবন-মান আর ব্রিটেনে জীবন-মানে বিস্তর ফারাক। ব্রিটেনে বসে যা ভাবা যায়, তা বাস্তবায়নও করা যায়। বই লিখে ন্যূনতম হলেও পাঠক ও বোদ্ধা বিশ্লেষকের দেখা পাওয়া যায়–যারা জাতি-ধর্ম-ত্বকের রঙ ভেদ-বিচার করে না। তারা কাজ দিয়েই কাজের বিচার করে। এ জন্য গুনরাহ ভাগ্যবান। তাঁর বইগুলো প্রাথমিকভাবে যুক্তরাজ্যে বাজারজাত হয়েছিল। প্রথম দু'তিনটি বইয়ের পাঠক না পেলে তিনি নিশ্চয়ই পরের বইগুলো লিখতেন না, প্রকাশক প্রকাশ করত না। ইউরোপীয় দেশগুলোতে বসবাসের এই এক বিশাল সুবিধা। দেরীতে হলেও শিল্পকর্মের মূল্যায়নটা হয়।

গুরনার বেশিরভাগ উপন্যাসেই জাঞ্জিবার ধরা দিয়েছে এর ভেতরের ক্ষতসহ। ১৮ বছর বয়সে লেখক শিক্ষার্থী হিসেবে স্বদেশ ত্যাগ করেন। সে সময় তাঁর দেশের বহুলোক বিপ্লবোত্তর তানজানিয়ার অশান্ত-সহিংস পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য পালিয়েছিলেন। জাঞ্জিবারে তখন আরব সংখ্যালঘু আর স্থানীয় অভিজাতদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ চরম আকার নিয়েছিল। একদল আরেকদলকে উৎখাত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

গুরনার লেখার বা ফিকশন সমগ্রের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো: এক জায়গার মানুষের আরেক জায়গায় বসবাস করেন। অর্থাৎ স্থানান্তরিত মানুষই তাঁর চরিত্র। যদিও তাঁর নিজের ভাষ্য হলো– আমার বইগুলো শুধু আত্মজীবনীমূলক দলিল নয়, এগুলো আমাদের সময়ের গল্পও। ভ্রমণ শুধু ঘরের সঙ্গে দূরত্বই তৈরি করে

না, বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত ও পরিস্থিতিকেও সামনে আনে, স্বাধীনতা ও পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা দেয়। এটি যেকোনো লেখকের পশ্চাতে ফেলে আসা মাতৃভূমির অভিজ্ঞতাসমূহকে কেন্দ্রিভূত করতে সাহায্য করে। এভাবে বিশ্লেষণ দেখা যায়–তাঁর রচনাকর্মের বিস্ময় ও ঘোর উত্তরোত্তর ঘনিভূত হয়, আকস্মিকভাবে মানুষ তার এক জীবন পেছনে ফেলে আসে এবং শরণার্থির জীবন তাকে ভাবনাহীন হতচ্ছাড়ায় পরিণত হয়। এভাবে তারা নিজেদের পেছনের জায়গা আর পথটি হারিয়ে ফেলে চিরতরে।

নোবেল পুরস্কার পাওয়া আফ্রিকানদের মধ্যে আব্দুর রাজ্জাক গুরনাহ সপ্তম। এর আগের আফ্রিকান যাঁরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁরা হলেন: আলজেরিয়ার আলবেয়ার কাম্যু (১৯৫৭), নাইজেরিয়ার ওলে সুইঙ্কা (১৯৮৬), মিশরের নাগিব মাহফুজ (১৯৮৮), দক্ষিণ আফ্রিকার নাদিন গর্ডিমার (১৯৯১), জিএম কুয়েৎজি (২০০৩), ডরিস লেসিং (২০০৭)। পুরস্কার হিসেবে গুরনাহ পাবেন ১০ মিলিয়ন সুইডিস ক্রোনা কিংবা ১১,৩৯,১৮৬ আমেরিকান ডলার, একটি গোল্ড মেডেল ও একটি ডিপ্লোমা। পুরস্কারের এই মূল্যের চেয়ে এর মান, গাম্ভীর্য অনেক বেশি। যত বড় আর ভালো লেখকই হোন না কেনো নোবেল প্রাইজ না পেলে বিশ্বের কোণে কোণে কেউ তাঁর নাম জানত না আরও একশ বছরেও। বিশ্বের দেশে দেশে কতশত উঁচুগুণ সম্পন্ন কবি লেখক এমন অখ্যাত ও অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছেন ভালো একটি সম্মাননা বা স্বীকৃতির অভাবে। তাঁর জন্য এটা বড়ই সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, গুরনার নোবেল প্রাপ্তির সংবাদটি ব্রিটেনের 'আফ্রিকান লিটারেরি কমিউনিটি'তে স্ফুলিঙ্গগতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে নাইজেরিয়ান কবি, লেখক নোবেল পুরস্কার (১৯৮৬) বিজয়ী ওলে সুইঙ্কা নোবেল কমিটিকে এক ই-বার্তায় ধন্যবাদ জানিয়ে লেখেন: 'দ্য নোবেল রিটার্নস হোম'। এ জন্যই বলতে হয়: নোবেল প্রাইজ একজন মানুষকে কতটা উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে আব্দুর রাজ্জাক গুরনাহ এর বড় প্রমাণ। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ব্লুমসবারিতে কর্মরত তাঁর সম্পাদক আলেক্সান্দ্রা প্রিঞ্জিল গুরনার নোবেল প্রাপ্তির খবর শুনে খুবই রোমাঞ্চিত হন। তিনি বলেন: "গুরনাহকে দীর্ঘদিন অস্বীকার করা হয়েছে। চিনুয়া আচেবের সমতুল্য ও গুরুত্বপূর্ণ তিনি। তাঁর লেখার শৈলিটি বিশেষভাবে সুন্দর। হাস্যরস, হৃদ্যতা ও সংবেদনশীলতায় পরিপূর্ণ।

আব্দুর রাজ্জাক গুরনার দশ নম্বর বই '*আফটারলাইভস*'। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রিটেনে এটি প্রকাশিত হলে মাস্টারপিসের স্বীকৃতি পায়। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ব্লুমসবারিতে কর্মরত তাঁর সম্পাদক আলেক্সান্দ্রা প্রিঞ্জিল খুব আশাবাদী ছিলেন যে, তাঁর বইটি সবচেয়ে বেশি পাঠক প্রিয়তা পাবে অর্থাৎ বেস্ট সেলার হবে। গত তিন দশক ধরে যারা তাঁর বইয়ের রিভিউ লিখে এসেছেন, তারাও

তাঁর এ বইটি নিয়ে খুব বেশি আশাবাদী হয়েছিলেন। বইটিতে তিনি আফ্রিকায় জার্মানির কলোনিয়েল শাসনের নির্মমতা তুলে ধরেছেন। কিন্তু আমেরিকায় প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও বৃহত্তর পাঠকের আনুকূল্য পায়নি। গুরনার সম্পাদকসহ কোনো আরও অনেকেই তখন ভেবেছিল: গুরনার সুদিন বুঝি আর এলো না। আর এখন এক বছর পরই, সুদিন এলো। গুনরাহ নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন। এখন তাঁর পা সেই ভূমিতে স্থান পেলো যা চষে উর্বর ও সমৃদ্ধ করে গেছেন গেব্রিয়েল গর্সিয়া মার্কেজ, আলবেয়ার কাম্যু, উইলিয়াম ফকনার আর টনি মরিসনের মত লেখিকা। এখন বিশ্বের সেরা প্রকাশকদের মধ্যে তাঁর বই সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও অনুবাদের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। তাঁর অ্যাজেন্ট, পিটার স্ট্রাউস বলেছেন, বহির্বিশ্বে তাঁর বই বিক্রির কর্তৃত্ব ৩০টি দেশে বিক্রি করা হয়েছে। দিন দিন এর সংখ্যা আরও বাড়ছে। তাঁর উপন্যাস '*প্যারাডাইস*' আগামী বছর প্রকাশ করতে যাচ্ছে আমেরিকান 'রিভারহেড'।

মি. স্ট্রাউস আরও বলেন: নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পর, আমেরিকার ছ'টি পাবলিশিং হাউস 'আফটারলাইভস' প্রকাশের আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। আমেরিকায় বিক্রির কর্তৃত্ব কেবল 'রিভারহেড'কে দেওয়া হয়েছে। আর মুদ্রণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে পেঙ্গুইন আর রেনডম হাউজকে। ২০২২ এর আগস্টে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। 'রিভারহেড' অবশ্য প্রিন্ট ভার্সন ফুরিয়ে যাওয়া পুরনো দু'টি উপন্যাস '*বাই দ্য সি*' আর '*ডেজার্সন*' নর্থ আমেরিকায় বিক্রির রাইট ক্রয় করেছে। রেবেকা সেলেতান, যিনি রেনডম হাউসের জন্য বইটি অধিগত করেছেন, সংবাদিকদের বলেছেন: "তাঁর উপন্যাসের জীবন বাস্তবতায় গভীর তাৎপর্যময়তা নিহিত এবং প্রায়শই ধ্বংসমুখী বর্ণনার জাদু যা উপনিবেশ ও উপনিবেশ উত্তর অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে সমৃদ্ধ।"

আন্তর্জাতিক প্রকাশকদের এত উদ্দীপনা আয়োজন দেখে, বহু পাঠক গুরনার লেখার নমুনা দেখার জন্য বই পেতে ভীষণ আগ্রহী হয়ে বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে ছুটে গেছেন, ধর্না দিয়েছেন। কিন্তু বই না পেয়ে তারা হতাশ হয়েছেন। কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে, বিক্রি করার মত বই প্রকাশকদের হাতে নেই। এমনকি ই-বুক ও অডিও-বুক সহজলভ্য নয়। এর কারণ হিসেবে, বিশ্ববোদ্ধরা বলছেন যে, আগে গুরনাহ পাঠক খুবই থাকায় প্রকাশকরা কম সংখ্যক বই প্রিন্ট করেছিলেন বলেই এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ♦

মন ও মননের কবি স্থপতি রবিউল হুসাইন

ইমাম মেহেদী

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে ইতিহাস-ঐতিহ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, স্থাপনা ও স্থাপত্যে শিল্পে অবদান রেখেছেন যে কয়জন কৃর্তিমান মানুষ তার মধ্যে কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন অন্যতম। ব্যক্তি যখন তাঁর শিল্পের বহুমাত্রিকতা দিয়ে সফলতায় পৌঁছে যান তখন তিনি রাষ্ট্রের সম্পদে পরিণত হন। কবি, সংগঠক ও স্থপতি রবিউল হুসাইন ঠিক সেই মাপের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাঁর মৃত্যুতে শোকবার্তায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্তব্য করেছেন– 'দেশ ও জাতি একজন বহুমুখী গুণের অধিকারী দেশপ্রেমিক বরেণ্য ব্যক্তিকে হারালো। তিনি একাধারে স্থপতি, কবি, শিল্প-সমালোচক, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক ও সংস্কৃতিকর্মী ছিলেন। পেশা স্থাপত্যশিল্প হলেও তার সম্পৃক্ততা ছিল বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে। মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষক রবিউল হুসাইন স্বীয় কর্মের মাধ্যমে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।' (২৬ নভেম্বর ২০১৯, চ্যানেল আই অনলাইন)

কবি রবিউল হুসাইনের জীবন ছিলো খোলা বইয়ের মত সুন্দর ও সুখপাঠ্য। যা পাঠ করে যতো গভীরে যাওয়া যায় ততোই মোহ তৈরি হয়। তাঁর কবিতার

মতো তার জীবনও পাঠককে দীর্ঘসময় ধরে রাখতে পারে। তাঁর কবিতা সম্পর্কে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নাসির উদ্দীন ইউসুফ তাঁর ছাত্রজীবনের স্মৃতিচারণ করে বলেন– 'তখন শামসুর রাহমান, আল মাহমুদদের জয়জয়কার। বাংলা কবিতার পালাবদলের সময়। সে সময় রবিউল ভাইয়ের কবিতাগুলো আমার কাছে বিস্ময়কর উপস্থাপন মনে হয়েছে। 'মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সংকটকালে সেনাশাসন, স্বৈরশাসনের সময়ে ছাত্র আন্দোলনে তিনি ছিলেন সোচ্চার। পরে জাতীয় কবিতা পরিষদের আন্দোলনে তিনি শক্তি জুগিয়েছেন। আমাদের প্রতিটি আন্দোলনে তিনি ছিলেন আমাদের প্রেরণা। তাঁর কবিতার শরীর ও ভাষারীতি ছিল অন্য কবিদের থেকে আলাদা, যা তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।' (১০ ডিসেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো)

কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন এর ডিজাইনে তৈরি হয়েছে দেশের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও নিদর্শন। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তি ও স্বাধীনতা তোরণ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ভাসানী হল, বঙ্গবন্ধু হল, শেখ হাসিনা হল, ওয়াজেদ মিয়া সায়েন্স কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম এবং একাডেমিক ভবন, বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্স ভবন উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান তাঁর প্রস্থানে মন্তব্য করেছেন, 'রবিউল হুসাইন কবি হিসেবে বিশিষ্টজন ছিলেন। তার নিজের যে বিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, সেখানেও তার একটা ভূমিকা ছিল। রবিউল হুসাইন সব সময় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে চলেছেন।' (২৭ নভেম্বর ২০১৯, সমকাল)

কবি কামাল চৌধুরী মন্তব্য করেছেন– 'আমরা সকলেই নিজের মধ্যে চেতনাবোধশূন্য নিয়ে আছি, কবি রবিউল হুসাইন তেমনি আরও এক শূন্যতা দিয়ে গেলেন।' (১০ ডিসেম্বর, ২০১৯, প্রথম আলো)

রবিউল হুসাইনের জন্ম ১৯৪৩ সালের ৩১ জানুয়ারি ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার রতিডাঙ্গা গ্রামে। বাবা তফাজ্জেল হোসেন এবং মা বেগম লুৎফুন্নেসা। তার লেখাপড়ার হাতেখড়ি গ্রামে। পরবর্তীতে কুষ্টিয়ার মুসলিম হাইস্কুল থেকে ১৯৫৯ সালে মাধ্যমিক ও কুষ্টিয়া কলেজ থেকে ১৯৬১ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। ওই বছরেই উচ্চ শিক্ষার্থে ঢাকায় চলে আসেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বর্তমান বুয়েট) আর্কিটেকচার বিভাগ থেকে ১৯৬৮ সালে পড়ালেখা শেষ করেন তিনি। তৃতীয় বর্ষে পাঠরত অবস্থায় তিনি প্রখ্যাত স্থপতি মাজহারুল ইসলামের সাথে কাজ শুরু করেন। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তার সাথে কাজ করেছেন রবিউল হুসাইন। ১৯৭৫ সালে বুয়েটে ফ্যাকাল্টি অব আর্কিটেকচার এন্ড প্লানিং বিভাগে পার্ট টাইম

ডিজাইন শিক্ষক পদে যোগদান করেন। এরপর ১৯৭৬ সাল থেকে আমৃত্যু সময় পর্যন্ত দেশের একটি খ্যাতনামা আর্কিটেক ফার্মের প্রধান স্থপতি ও পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। ছাত্রজীবন থেকে সাহিত্য চর্চা করেতেন এই স্থপতি। একসময় কবি পরিচয়ই তাকে মানুষের কাছাকাছি এনে দেয়। হয়ে ওঠেন একজন খ্যাতিমান কবি। কবিতা ছাড়াও ছোটগল্প, নাটক, স্থাপত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, শিশু সাহিত্যে ও চিত্রকলাতেও তার বিচরণ অসামান্য। স্থাপত্য ও সাহিত্য চর্চার বাইরেও তিনি নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত থেকেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করেছেন বিভিন্ন সময়ে। বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, বাংলা একাডেমি, কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর, জাতীয় কবিতা, বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সিটিটিউট।

যতদিন বিশ্বের মাঝে বাংলাদেশ থাকবে ততোদিন থাকবেন শিল্পী রবিউল ইসলাম তার কর্ম দিয়ে। কারণ তিনি বাস্তবে যেমন ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী, মৃত্যুর পরও তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। জাতিসত্তার কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা মন্তব্য করেছেন– 'কবি রবিউল হুসাইন ছিলেন অজাতশত্রু। তিনি নিজে কত বড় ছিলেন, তা তাঁর আন্দাজেও ছিল না। বিনয়ই ছিল তাঁর বড় অহংকার। সৃজনকর্মে রবিউল হুসাইন ছিলেন সতত চলমান।' (০১ ডিসেম্বর, ২০১৯, ভোরের কাগজ)

বরেণ্য চিত্রশিল্পী হাশেম খান উক্তি করেছেন– 'আমার সঙ্গে তাঁর ছিল ৪০ বছরের সম্পর্ক। আমরা একসঙ্গে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, ঢাকা নগর জাদুঘর, বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা জাদুঘরের কাজ করেছি। রবিউল হুসাইন চিত্রকলা

নিয়ে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে মন্তব্য করতেন। তিনি কত বড় স্থপতি, সংগঠক, কবি, সে কথা বলব না, বলব তিনি ভালো মানুষ ছিলেন।' (১০ ডিসেম্বর, ২০১৯, প্রথম আলো)

রবিউল হুসাইনের ২৫টির বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– কী আছে এই অন্ধকারের গভীরে (২০১৯), আরও উনত্রিশটি চাঁদ (২০১১), স্থিরবিন্দুর মোহন সংকট (২০১৫), কর্পুরের ডানাঅলা পাখি (২০১২), আমগ্ন কাটাকুটি খেলা (২০১২), বিষুবরেখা (২০০১), দুর্দান্ত (২০০১), অমনিবাস (২০১০), কবিতাপুঞ্জ (২০০১), স্বপ্নের সাহসী মানুষেরা, যে নদী রাত্রির, কি আছে এই অন্ধকার গভীরে, এইসব নীল অপমান (২০১৩), অপ্রয়োজনীয় প্রবন্ধ (২০১৫), দুরন্ত কৈশোর (২০১৯), বাংলাদেশের স্থাপত্য সংস্কৃতি (১৯৯৬), বাংলাদেশের স্থাপত্য সংস্কৃতি ও অনান্য রচনা (২০১৭), নির্বাচিত কবিতা (২০১৭), হাউল ও উনিশটি কবিতা (২০১৬), বিশটি ভালোবাসার ও একটি হতাশার গান (২০১৪) গল্প গাথা (২০১৭), ছড়িয়ে দিলাম ছড়াগুলি (২০১৬), স্থপতি মাজহারুল ইসলাম (২০১৫) ইত্যাদি।

কবি রবিউল হুসাইন সম্পর্কে কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক তার 'রবিউল হুসাইন ভাই, স্যালুট' শিরোনামে একটি লেখায় মন্তব্য করেছেন– 'রবিউল ভাই ছিলেন মাটির মানুষ। কিন্তু তাঁর পোশাক আশাকে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। একটা পশমি কোর্ট, কালো প্যান্ট, পায়ে জুতা, আর কাঁধে ঝোলানো মাফলার তাকে অনন্য করে রাখত। পাইপ টানতেন। জুলফি বড়। জুলফিতে সাদার আঁচর। বড় সুদর্শন মানুষটিকে আরও সুন্দর করত তাঁর অম্যায়িক ব্যবহার।' (২৬ নভেম্বর, ২০১৯, প্রথম আলো)

রবিউল হুসাইন বাংলা কবিতা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ ২০০৯ সনে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ২০১৮ বাংলা ভাষা সাহিত্যে অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে একুশে পদকে ভূষিত করেন। এছাড়াও তিনি আরও অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা এবং স্বীকৃতি অর্জন করেছেন।

২০১৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভোরে ৭৬ বছর বয়সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় না ফেরার দেশে চলে যান তিনি। প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার এই মানুষটির অবদান অসামান্য। বাংলাদেশ যতদিন থাকবে ততোদিন থাকবে কীর্তিমান মানুষ স্থপতি রবিউল হুসাইনের স্মৃতি। তিনি স্বীয় কর্মের মাধ্যমে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।♦